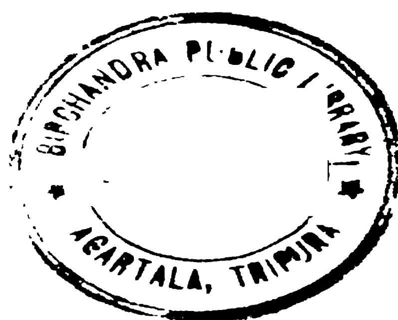
অপারেশান অ্যাঙ্গোলা

বেদুইন



পূর্বাচল
কলিকাতা-১

প্রকাশক :

সুধীন্দ্র চৌধুরী

৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—দোল পূর্ণিমা, চৈত্র ১৩৩২

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :

শ্রীধনঞ্জন দে

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

বারো টাকা

গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীকে
শ্রদ্ধার্ঘ

OPERATION ANGOLA
Bedouin
Rs. 12·00



স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার মুক্তিদাতা ডাঃ অগাষ্টিনহো নেটো ।



M.P.L.A. সমর্থক কিউবান সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত
উত্তর অ্যাঙ্গোলার সামব্রিজ সহর ।

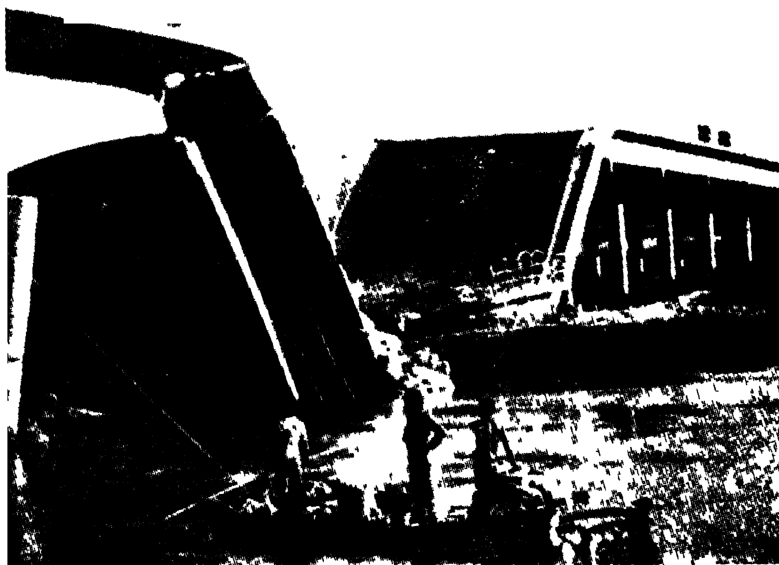


M.P.L.A. নারী সৈনিক।

লুয়াণ্ডা বন্দরে রাশিয়ান যুদ্ধজাহাজ হইতে ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, তরপাল্লার



কিউবান ও M.P.L.A সৈন্যদল কর্ত্তৃক ধৃত F.N.L.A সৈন্য।



দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদল কর্ত্তৃক নোভা রেডানডাব একটি বিধ্বস্ত সেতু।



রাশিয়াপন্থী M P L A …

এক

জাহাজের গতি অতি মন্থর। বন্দর আর দূরে নয়।

সকালের রক্তিম আকাশের বুকে সবে মাত্র হয়েছে সূর্যোদয়। সূর্যের আলোতে ঝক্‌মক্ করছে নীল সমুদ্রের অগুনতি ফেনিল উর্মিমালা। ছোট-বড় ঢেউয়ের আনাগোনায় ভারত সাগরের পশ্চিম-সীমান্ত কমবেশী চঞ্চল।

আরও চঞ্চল জাহাজের মাঝি-মাল্লা, নাবিক-জাহাজী, কাপ্তেন-ইন্‌জিনিয়ার। সবাই তখন ব্যস্ত। ব্যস্ততার সঙ্গে কেমন একটা পরিতৃপ্তির ছাপ সকলের চোখে মুখে। অনেক দিন পরে কি যেন তাদের ফিরে পাবার সুপ্ত বাসনা সার্থক হতে চলেছে। ছায়া যেন ক্রমেই কায়ার দিকে এগোচ্ছে, যতই এগোচ্ছে ততই কর্মব্যস্ততা।

সামনে মোম্বাসা বন্দর।

চতুর্থ সারির ইন্‌জিনিয়ার মীরচান্দানীর এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। শিক্ষাকাল শেষ করে জাহাজের চাকরি পেতে দেরী হয় নি। বোম্বাই বন্দর থেকে "এম-ভি জলযান" জাহাজে যে উৎসাহ উদ্দীপণা নিয়ে সে কদম রেখেছিল সেই উৎসাহ উদ্দীপণা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সমুদ্র যাত্রার প্রথম দিনের উল্লাস ধীরে ধীরে মিইয়ে যেতে থাকে, নির্দিষ্টস্থানে পৌছবার কষ্টদায়ক ইঙ্গিত যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপলাভ করল। জল আর জল। বিশাল জলরাশির বুকে দিন কাটে, রাত কাটে, জলের আর শেষ নেই। ছোটবেলায় ভূগোল পড়েছে, পৃথিবীর তিন-ভাগ জল। সেই জলরাশির বিরাট অথচ ভয়ঙ্কর চেহারা মীরচান্দানীকে কেমন যেন ম্রিয়মান করে তুলেছিল।

জলের বুক কেটে উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে করতে জাহাজটা যেন হাঁপিয়ে উঠছে। ইনজিন ঘরের ফোঁস-ফোঁসানি

শুনতে শুনতে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে মীরচান্দানী। ইন্‌জিন ঘর থেকে কোন রকমে কর্মকাল শেষে দেহটাকে টেনে তোলে উপরের ডেকে। দুলতে দুলতে ছুটে যায় তার কেবিনে। গা এলিয়ে দেয় বিছানাতে চরম ক্লান্তি বিমোচন করতে। কোন রকমে স্নানাহার সমাপন করে কেবিনের দরজা শক্ত করে এঁটে ঘুমের কোলে আশ্রয় নেয়। কোন দিন ঘুমের পর বাইরে এসে দেখে মধ্যাহ্ন সূর্য মাথার ওপর। কোন দিন দেখতে পায় লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মেলা বসেছে নীল আকাশের কোলে। দেহের ক্লান্তি অপনোদন ঘটতে না ঘটতেই মানসিক ক্লান্তির চাপে সে হারিয়ে ফেলে নিজস্ব সত্বা। তার মন কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

মাটি! শুধু মাটির কোলে হামাগুড়ি দেবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা তার মনে দোল দেয়। নির্দয় মাটি 'মা' দূর থেকে হাত-ছানি দেয়, টেনে কোলে তুলে নেয় না।

বন্দর আর দূরে নয়।

সামনেই বন্দর।

সকালের আলোতে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠে বন্দরের দৃশ্য। যাকে স্থানু, স্থবির ও জড় মনে হয়েছে, তাকেই এখন মনে হচ্ছে প্রাণের প্রাচুর্যে দামাল। সমুদ্রের জল জাহাজের গায়ে যেন হাত বুলিয়ে আহ্বানের সুললিত মধুর ছন্দভরা-সঙ্গীত শোনাচ্ছে। মীরচান্দানী মাটি-'মায়ের' পরশ পেতে আকুল। আকুতির মাঝ দিয়ে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব সমাপ্তির ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিত তার পরিবেশকে যেন আরও সুন্দর করে তুলেছে।

মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তি অপনোদনের সুবর্ণ সুযোগ সবার সামনে। যাত্রীরা ভীড় করেছে ডেকের রেলিং-এ। অনেকের বিছানা-পেঁটারা বাঁধা-ছাঁদা শেষ। যারা মোম্বাসার যাত্রী তারাই মাটির ছোঁয়া পেতে আকুল আগ্রহে মিনিট-ঘণ্টার হিসাব করছে। যারা দূরের যাত্রী তারা দর্শক মাত্র। মীরচান্দানীর মত ওরা সবাই

অধীর প্রতীক্ষা করেছে বন্দরের। এ যেন কোন বিরহিণী প্রিয়ার রাত্রি জাগরণের পর প্রিয়জনের বুকে ঝাঁপিয়ে পরার অপেক্ষা। প্রিয়জনের বক্ষে মুখ রেখে সে বেদনার্ত প্রতীক্ষার সমাপ্তি যেন চায়।

ধীরে ধীরে জেটিতে জাহাজ ভিড়ল।

সিঁড়ি নামানো হল।

গতানুগতিক ব্যবস্থা। নতুনত্ব কিছু নেই।

গন্তব্যস্থলে নামার হুড়োহুড়ি শেষ হতেই দূরের যাত্রীরা ধীরে ধীরে নামতে থাকে। এদেরই একাংশ শহর দেখবে, অপরাংশ জীবনকে ভোগ করার লালসা নিয়ে নামছে মাটিতে। সবারই পকেটে শহর বেড়াবার সাময়িক অনুমতি পত্র। পকেটে বিদেশী মুদ্রা।

মীরচান্দানী কেবিনের দরজায় হেলান দিয়ে দেখতে থাকে জনতার স্রোত। মাটিতে পা দেবার তারও প্রবল বাসনা তবুও কেনবা নামতে পারেনি এখনও। যে সব জাহাজী এ পথে চলাচল করেছে তাদের অনেকেই বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই শহরের কোন কোন নিষিদ্ধ পল্লীর দিকে ছোটে। অফিসাররা ধীরে সুস্থে সময় বুঝে জাহাজ থেকে নীচে নামে। তাদের আস্তানা নিষিদ্ধ অভিজাত স্থানে।

এসব কাহিনী মীরচান্দানী শুনেছে। আজ প্রত্যক্ষ করার প্রায় সুযোগ পেয়েছে।

মীরচান্দানী!

ডাক শুনে ফিবে তাকাল মীরচান্দানী।

কি দেখছ এখানে দাঁড়িয়ে?

ওদের। বলেই মীরচান্দানী মৃদু হাসল। তার অলস দৃষ্টিতে কোন জিজ্ঞাসা নেই।

প্রশ্নকর্তা জাহাজের ডাক্তার জোনাস।

জোনাস সোমালি আফরিক্যান। গায়ের রং মিশ কালো। উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুট। চোয়াল উঁচু। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া

চুল। ঠোঁট দুটো পুরু। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর প্রশস্ত কপালের রেখা বুদ্ধিদীপ্ত করে রেখেছে তাকে।

মীরচান্দানী যেমন নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল ডাক্তার জোনাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, তোমাকে হোম সিক্ মনে হচ্ছে।

মীরচান্দানীর উদাসীনতা আর রইল না। মৃদু হেসে বলল, ঠিকই বলেছ। ওদের নামতে দেখছি আর ভাবছি। ওদের সঙ্গে মাটিতে নেমে মাটির পরশ পেতে চাইছে আমার মন, কিন্তু দেহটা কেনবা বিকল হয়ে গেছে। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে পারছি না। ভাবছি, ওদের মত উল্লাসে আবার কবে আমি বোম্বের মাটির ছোঁয়া পাব।

জোনাস বুঝল তার মনের কথা। সহানুভূতিতে তার চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠল। দম নিয়ে বলল, সে তো অনেক দেরী।

জানি। জেনেই বলছি।

এই তো তোমার প্রথম ভয়েজ। প্রথম সমুদ্র যাত্রা আমাকেও এইভাবে ব্যাকুল করেছিল। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হয়ে যায়। তখন আর মাটির আকর্ষণ বিশেষ থাকে না। আমি, বুঝলে মীরচান্দানী, মাটির স্পর্শে আমি এখন হাঁপিয়ে উঠি। বড় জোর দশদিন। তারপরই সমুদ্র আমাকে হাতছানি দেয়। মাটির মায়া ধীরে ধীরে চুপসে যায়। আমি আবার ছুটে যাই জাহাজে। আবার কবে জাহাজ ভাসবে তার দিন গণনা করি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মীরচান্দানী।

জোনাস আবার বলল, তোমার কিন্তু সবটাই উল্টো। জাহাজের জীবন বড়ই এক ঘেয়ে। এর মাঝে কোন আনন্দই তুমি পাবে না।

ঠিক বলেছ ডাক্তার। কোন আনন্দ নেই, শুধু রয়েছে কাজ আর কাজের ক্লান্তি, শুধু রয়েছে উদাস ভাবনা আর ভাবনা শেষের ক্লান্তি।

ডাক্তার জোনাস নিজেও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, মীরচান্দানীর জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই। মীরচান্দানী থামতেই উদাস ভাবে

জোনাস বলল, এই অবস্থার মোকাবিলা আমাকেও করতে হয়েছে। একবার কেপ্‌টাউনে কি যে বিভ্রাট ঘটেছিল!

মীরচান্দানী নিজের মনেই বলল, কেপ্‌টাউন!

হাঁ, সেখানে। কালো-সাদার বড় দ্বন্দ্ব চলছে ওই দেশেই। যারা দেশের মানুষ তাদের স্থান নেই সে দেশে। আর যারা পশুশক্তি দিয়ে ওদেশ দখল করেছিল তারাই আজও পশুশক্তি দিয়ে ওদেশটা দখল রেখেছে। শুধু তাই নয়, বোধহয় ওই দেশের মতো সাদা-কালোর পার্থক্য আর কোথাও নেই।

আমাদের তো যেতে হবে না সেখানে।

যেতে হবে। কেপ্‌টাউনে মাল নামাতে হবে।

কিন্তু! ভারতীয়দের সেখানে যাওয়া নিষেধ।

এটা তো ভারতীয় জাহাজ নয়। হংকং-এ রেজিস্ট্রী করা জাহাজ। তবে তুমি ভারতীয়। জাহাজ থেকে তোমার নামা উচিত হবে না।

মীরচান্দানী বলল, দক্ষিণ-আফ্রিকা আর পর্তুগীজ এলাকা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তবে পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখন বোধহয় আমি পর্তুগীজদের উপনিবেশেও যেতে পারব।

জোনাস বলল, অবশ্যই। আফরিকার মানচিত্র ক্রমেই বদল হচ্ছে। সমগ্র আফরিকার কালো মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে। এখম শুধু বাকি রয়েছে নামিবিয়া, স্পেনীশ সাহারা। আর সংখ্যা-লঘু শ্বেতকায়ার দল দখলে রেখেছে রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফরিকা। পশ্চিমীদেশ থেকে যেমন দলে দলে লুণ্ঠক এসে আফরিকার সম্পদ হরণ করেছে শত শত বৎসর ধরে তেমনি তারা দলে দলে আফরিকার মায়া কাটিয়ে ফিরেও যাচ্ছে। যাবার আগে ওরা অবশ্য ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এইটুকুই দুঃখের বিষয়।

মীরচান্দানী মৃদুস্বরে বলল, ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, জার্মান, ওলন্দাজ, স্পেনীশ, ইতালীয়ান; এমন কি ক্ষুদে বেলজিয়ানরাও

সুযোগ বুঝে গোটা মহাদেশটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। বাকি ছিল একমাত্র আবিসিনিয়া, সেটাও রেহাই পায়নি ইতালীর হাত থেকে। গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকার আফরিকার মানচিত্রে একটিও স্বাধীন দেশ ছিলনা। আফরিকার মানুষ আজ নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। যাক্ ওসব কথা। আজ বিকালে মোম্বাসার অবস্থা দেখতে নিয়ে যাবে কি? তুমিতো বহুবার এসেছ। চেনাশোনা নিশ্চয়ই আছে।

ডাক্তার বলল, আমার আপত্তি নেই। বেশি রাত করা হবেনা। সন্ধ্যের আগেই ফিরতে পারলে ভাল হয়। এসব বন্দর এলাকার চারপাশের পরিবেশ মোটেই সুখপ্রদ নয়। এ শুধুমাত্র আফরিকার কথা নয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই। এমন কি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতেও সতর্ক হয় চলতে হয় জাহাজীদের। রাতের বেলায় বাইরে না থাকাই যুক্তিযুক্ত।

বন্দরের পরিবেশ কি সমাজতান্ত্রিক দেশেও আবর্জনাপূর্ণ?

একেবারে পরিচ্ছন্ন নয়। একবার ওদেসায় ট্যাক্সি করে বেড়াতে বের হয়েছিলাম। প্রথমেই ট্যাক্সি ড্রাইভার সর্ত আরোপ করল। মিটারের যা ভাড়া হবে তা থেকে শতকরা তিরিশ ভাগ বেশি দিতে হবে। এক রুবলের সঙ্গে তিরিশ কোপেক বেশি দিতে হবে।

অর্থাৎ জুলুমবাজী। কালোবাজারী।

নিশ্চই। বাহির থেকে আমরা এইসব সমাজতান্ত্রিক দেশের যেসব কথা ও কাহিনী শুনি তার সঙ্গে বাস্তবের অনেক পার্থক্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ সমাজতন্ত্রের অনুগামী মানসিকতা গড়তে যে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে এটা মনে করা ভুল। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কথাই বলছি। আরও নোংরা ঘটনা এখনও ঘটে, এখনও গোপনে দেহ বিক্রয়কারী নারী বন্দর এলাকায় অলভ্য নয়। অবশ্য এই সব দুর্নীতির সংখ্যা খুবই কম। ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তবুও সামাজিক পাপ চিরকালের মত বিলুপ্ত

হয়নি রাশিয়ার মত দেশেও। আর এইসব দেশতো সবেমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছিষ্ট বিকৃত রুচি আফিং-এর নেশার মতো এদের থাকবেই। হংকং থেকে হনলুলু, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু যেখানেই যাও, একই অবস্থা। আমি চিকিৎসক, বিচিত্র আমার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে রুগ্ন জাহাজীদের চিকিৎসাই আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে আরও বেশি সজাগ করেছে। এসব আলোচনায় কোন ফায়দা নেই। এসব ঘটনাকে ঘটনা বলে কেউ মনে করেনা। স্বাভাবিক পরিণতি মনে করে।

চল আজ বিকেলে বন্দর শহরকে দেখে আসি, জেনে আসি।

ডাক্তার জোনাস নির্বিকার ভাবে বলল, তথাস্তু।

বিকেল বেলায় মীরচান্দানীর কেবিনের দরজায় শব্দ হতেই মীরচান্দানী ভেতর থেকে জবাব দিলো 'হাঁ' আমি প্রস্তুত।

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল মীরচান্দানী। ডাক্তার জোনাস আসেনি। দরজায় দাঁড়িয়ে একটি মহিলা। তার চেহারা থেকে অনুমান করতে পারল না কোন দেশের এই মেয়ে। ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিতা যুবতী মহিলার গায়ের রং আফরিকার আদিম নিগ্রোর রং নয়, অনেকটা তামাটে। নিগ্রোদের মত বেঁটে মোটাও নয়। মাথার চুলও তেমন কর্কশ নয় তেমনি চোয়ালও উঁচু নয়।

মীরচান্দানী নিজের অবস্থা কাটিয়ে উঠতে দেরী করল না। জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?

স্পষ্ট এবং শুদ্ধ ইংরাজীতে বলল, তোমার কাছেই এসেছি।

আমিতো তোমাকে চিনি না।

আমিও তোমাকে চিনি না। চেনা-অচেনার কোন প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। তোমাদের ডাক্তারসাহেব বললেন, তুমি শহরে বেড়াতে চাও। একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। আমি বলতে চাই সঙ্গী, মানে

পরিচালক। এই ক্ষুদ্র সেবার অধিকার আমাকে দিলে তুমি কিন্তু নিরানন্দিত হবে না।

কিন্তু। আমার সঙ্গে ডাক্তার জোনাস নিজেই যাবেন, এই ব্যবস্থাই ছিল। আমি দুঃখিত।

দুঃখিত হবার কিছু নেই। ডাক্তার সাহেবও যাবেন। আমি তৃতীয় ব্যক্তি। তারই নির্দেশে এসেছি।

মীরচান্দানীর সব গোলমাল হয়ে গেল।

মহিলাটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা চল। দুজনে ডাক্তারের কেবিনের দরজায় ধাক্কা দিতেই ডাক্তার দরজা খুলে দিয়ে বলল, আমি প্রস্তুত। ডাক্তার জোনাস মহিলাটির হাত ধরে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। পেছন পেছন চলল মীরচান্দানী, যেতে যেতে ডাক্তার বলল, একটু অবাক হয়ে গেছ তাই না?

তা বলতে পার। হঠাৎ মহিলার আবির্ভাবটা কিছুটা অবাক করেছে বই কি!

তোমার মত আমিও অবাক হয়েছি প্রথম ভয়েজে। তুমি তো জান, আমাদের কোম্পানীর এজেন্ট আছে মোম্বাসায়। তাদের কাছে সাহায্য চাইলে গাইডের ব্যবস্থা করে ইনি, মানে মিসেস অবসামবু একজন গাইড, এজেন্টের নিজস্ব লোক।

কোন পুরুষ গাইড কি নেই?

তুমি মূলত একজন বেওকুফ। নারীর সঙ্গে পথ চলার আনন্দটুকু তুমি পেতে চাও না দেখছি। পথে নারী বর্জন করে মুর্খ। নর-নারীর সম্পর্কটা যতই ঘোরালো হোক, পথ চলতে নারী বর্জন মানেই সৌন্দর্য ও আনন্দ বর্জন করা। সেটা বুঝবার বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে।

মীরচান্দানী গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাই বল। আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মরছিলাম। বিশেষ করে ভাবছিলাম, আফরিকার নিগ্রো সুন্দরীর হাত ধরে চলার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব না।

তুমি কি ভেবেছ মিসেস অবসামবু নিগ্রো নন? উনিই নিগ্রো, তবে রক্তে মিশ্রণ রয়েছে। মোজাম্বিকের মেয়ে। দারুস সালামে বড় হয়েছেন। পিতৃত্বের দাবীদার খাস পর্তুগীজ, মাতৃত্বের দাবীদার খাস নিগ্রো। তাই রংটা তামাটে, চেহারায় নিগ্রো ভাবটা কম। আমি ঠিক বলছি কি মিসেস অবসামবু?

মিসেস অবসামবু হেসে মাথা নাড়ল।

ডাক্তার বলতে লাগল, তবে মিসেস অবসামবুর পুরো নামটা হল, মিসেস অবসামবু পারেখ। বর্তমানে উনি একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী। গুজরাটে শ্রীমতীর শ্বশুরবাড়ি হলেও তিনি তানজানিয়ার নাগরিক। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন আমাদের এজেন্ট কোম্পানীতে। প্রতিবার জাহাজ ভিড়লে উনি আসেন জাহাজীদের খবরাখবর করতে। এবারও এসেছিলেন, তোমার গাইড হবার জন্য ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম। সেই সুবাদেই এসেছেন।

কথা শেষ করেই ডাক্তার হাসতে থাকে। মীরচান্দানী লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিল না। কোন রকমে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে নেমে হাত জোড় করে বলল, আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

মিসেস অবসামবু সামান্য থেমে বলল, এতো স্বাভাবিক। ক্ষমা চাইবার মত কিছুই নেই ইনজিনিয়ার সাহেব।

রাস্তায় এসে মিসেস অবসামবু ট্যাকসি ডাকল।

আমরা কোথায় যাব?

প্রথমে আমাদের অফিসে। সেখানে কারেন্সী বদল করে নেব। তারপর বেড়াতে বের হব। মোম্বাসা তো ভারতবর্ষ নয়। হাজার হাজার বছরের পুরাতন স্মৃতি সৌধ নেই, আবার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী কোন সংস্কৃতিও গড়ে উঠেনি। বন্য আফরিকানদের সভ্যতার আলোক যারা প্রদর্শন করে বর্তমান অবস্থায় টেনে এনেছে তাদেরই সামান্য কীর্তি ও কুকীর্তি দেখতে পাবে এখানে। সভ্যতার

আলোক বর্তিকা বহনকারী ছিল সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তি, তাদেরই দেওয়া সব কিছু নিয়ে বর্তমান আফ্রিকার এই অংশ গড়ে উঠেছে। এখানে মিশরের মত ঐতিহ্য নেই, পুরাতন সভ্যতাও নেই, পুরাতন কীর্তি নেই। আছে শুধু পশ্চিমীদের মুখোসধারী একদল কালো মানুষ। এই কালো মানুষ আত্মসচেতন হয়েছে এই মাত্র নতুনত্ব।

ট্যাকসি এসে দাঁড়াল এজেণ্ট কোম্পানীর দরজায়। ভাড়া মিটিয়ে মিসেস অবসামবু সঙ্গীদের নিয়ে অফিস ঘরে প্রবেশ করল।

ক্যাশ অফিসের সামনে দাঁড়াতেই ক্যাশিয়ার জিজ্ঞেস করল, কি চাই?

তানজিনিয়ার মুদ্রা।

বিনিময়?

মার্কিন ডলার।

ক্যাশিয়ার কোন উচ্চবাচ্য না করে ডলারের বদলে স্থানীয় মুদ্রা হাতে তুলে দিয়ে নমস্কার জানায়।

মিসেস অবসামবু নিজের চেম্বারে তাদের বসিয়ে বলল, কফি, কোকো?

ডাক্তার জোনাস বলল, মিল্ক কোকো। খুব প্রীতিকর। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

মিসেস অবসামবু বলল, অবশ্য। কয়েক মিনিট। ভয় পেওনা, ঠিক সময়মত তোমাদের জাহাজে পৌঁছে দেব। অসুবিধা হলে, আজ রাতে আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে পার।

সে সব পরের কথা। এখন তো মিল্ক কোকো।

অবসামবুর ব্যবস্থাপনায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্লাসভর্তি দুধ কোকো দিয়ে গেল একজন বেয়ারা। খাস নিগ্রোজাত সম্ভূত এই বেয়ারার দিকে মীরচান্দানীকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবসামবু বলল, এই হোল নির্ভেজাল আফরিক্যান। জাম্বিয়ার সন্তান।

মীরচান্দানী কোকোর গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, এদের ইতিহাস?

ইতিহাস কিছুই নেই!

আফরিকার কোন ইতিহাস নেই ?

আছে। সে ইতিহাস হল উত্তর আফরিকার ইতিহাস। আফ্রো-এশীয় সংযোগস্থলের ইতিহাস। অসভ্য বন্য নিগ্রোদের ইতিহাস হল পশ্চিমী উপনিবেশকারীদের দয়ায় গড়ে উঠা ইতিহাস। সেও পাঁচশ' বছরের ইতিহাস। মিশরের মত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এখানে গড়ে ওঠে নি। আফরিকাতেই নাকি প্রথম সভ্যতা বিকাশ লাভ ঘটেছিল। মিশর ছিল সভ্যতার পীঠস্থান। অথচ সেই আফরিকার মধ্যদেশে এবং দক্ষিণ অংশের মানুষ সপ্তদশ শতাব্দী অবধি ছিল বন্য, অসভ্য, নরমুণ্ড শিকারী। তাই ইতিহাস রয়েছে অন্ধকারের। আরেকটি ইতিহাস হল অত্যাচার, শোষণ ও লাঞ্ছনার। পশ্চিমী পশুশক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। সেই শক্তি শোষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে কালো মানুষদেব। পশুপক্ষী জীব জন্তুর মত তাদের বিক্রি করেছে দেশ বিদেশের বাজারে। পশুর উপযোগী খাদ্য তারা পায় নি। শ্বেতকায় দল তাদের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করতে কালো মানুষদের রক্তে হাত রাঙিয়েছে, শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে, লাঞ্ছিত করেছে, বিনিময়ে তারা দেযনি তাদের পেট ভর্তি সামান্য আহার্য। পরিধেয় তাদের দেয়নি, বাসস্থান তাদের দেয় নি, মানুষের মর্যাদা তাদের দেয় নি। সভ্য শ্বেতকায় সম্প্রদায় পশুর চেয়েও হীন মনে করত তাদের।

মীরচান্দানী বিরসভাবে বলল, এসব জানি। ভারতের পথে ঘাটে কালো মার্কিনীদের দেখেছি। তারাই হল ক্রীতদাসদের বংশধর। আইন তাদের মর্যাদা দিলেও, শ্বেতসম্প্রদায় আজও তাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেশিয়াতে কালো মানুষের মর্যাদা বাড়ির পোষা কুকুরের চেয়েও অনেক নীচুস্তরের।

এই হল কালো মানুষদের ইতিহাস। সাদা মানুষের লেখা ইতিহাসে কালোকে পশুর সম মর্যাদায় ভূষিত করেছে, মানুষের মর্যাদা দেয় নি, তাই ধারাবাহিক কোন ইতিহাস তৈরী হয় নি কালো

মানুষদের। বর্তমানের ইতিহাস আরও বিচিত্র। তুমি নতুন এসেছ। এবার পরিচয় পাবে কালো মানুষদের। তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি ট্যাকসি ডাকার ব্যবস্থা করে আসছি।

অবসামবু উঠে দাঁড়াল।

পেছন পেছন ডাক্তার জোনাস এগিয়ে গেল। মীরচান্দানী একাই বসে রইল টেবিলের সামনে। সামনে খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশচুম্বী অট্টালিকার সারি। পড়ন্ত বেলার রোদ ঝিলমিল করছে সেই সব অট্টালিকার মাথায়। মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ কানে ভেসে আসছে। মীরচান্দানীর মন তখন ছুটে চলেছে ভারতের কোন এক পল্লী অঞ্চলে যেখানে তার মা-বাবা ভাই বোন অবসর সময়ে তারই কথা হয়ত স্মরণ করছে। মীরচান্দানী যেন ধ্যান করছিল। ধ্যানভঙ্গ হল ডাক্তার জোনাসের ডাকে।

চল। ট্যাকসি এসে গেছে।

ঘুমন্ত মানুষ যেমন জেগে উঠে তেমনি যেন জেগে উঠল মীরচান্দানী। কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে ডাক্তার জোনাসের পেছন পেছন বাইরে এসে দাঁড়াল।

সমুদ্রের কিনারা থেকে সোজা বড় রাস্তা এসে মিশেছে তার সম্মুখের রাস্তার সঙ্গে, সেই বড় রাস্তাটায় বড়ই ব্যস্ততা, গাড়ির ভীড়। সারিবদ্ধ গাড়ি ছুটছে। দূরে সমুদ্রের ক্ষীণ রেখাও দেখা যাচ্ছে। জেটিতে জমায়েত জাহাজের মাস্তুলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাস্তুলের মাথায় উড়ছে বিভিন্ন দেশের পতাকার সঙ্গে এদেশের পতাকা। মনোরম সেই দৃশ্যের দিকে নজর রেখে মীরচান্দানী ধীরে ধীরে ট্যাকসিতে উঠে বসল।

চালক ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র গাড়ি ছোটালো আদি শহরের দিকে।

সমুদ্রের কিনারে বসবাসকারীর অধিকাংশই বিদেশী। বিদেশীরা আফরিকা শোষণ করে সুন্দর করে সাজিয়েছে বন্দর এলাকা। বন্দর এলাকা পেরিয়ে দেশীয় এলাকায় গাড়ি প্রবেশ করতেই দেখা গেল

কালো মানুষের ভীড়। বস্তি বাড়ির অধিবাসীরা পৃথিবীর সকল দেশের বস্তিবাসীদের মত প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিনান্তের কাজের শেষে পথের ধারে ধারে ভীড় জমিয়েছে, কোথাও শিশুরা কোলাহল করছে। নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণে কোন দ্বিধা সঙ্কোচের বালাই নেই। গাড়ির গতি তখন মন্থর। মানুষ চাপা দেবার শঙ্কা যথেষ্ট।

অবসামবু ফিস্ ফিস্ করে বলল, এই হল আফরিকার বর্তমান রূপ। স্বাধীনতা লাভের পর যে দেশের মানুষ এইভাবে দিনাতিপাত করে তাদের অবস্থা কত শোচনীয় ছিল পরাধীন যুগে তা তুমি কল্পনা করে নিতে পার। তবুও বিদেশী ইংরেজ শাসকদের কিছুটা মনুষ্যত্ববোধ ছিল। পর্তুগীজ জলদস্যুদের স্বরূপ তুমি দেখতে পাবে মোজাম্বিকে। কত যে রক্তপাত ঘটছে পর্তুগীজ শাসনে তার হিসাব কেউ দিতে পারে কি? তবুও মোজম্বিকের মানুষ লড়াই করে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। অ্যাঙ্গোলার বুকে ভ্রাতৃরক্ত স্নানের অভিশাপ রেখে গেছে। কি ভয়ঙ্কর যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব তা যদি দেখতে চাও তা হলে যাবার পথে লুয়ান্দাতে জাহাজ নোঙর করিও। তিন বৃহৎশক্তির নেপথ্য চক্রান্তে যে লড়াই চলছে তার পরিণতি কি যে হবে তা সৃষ্টিকর্তাও জানে না।

ডাক্তার জোনাস কোন মন্তব্য না করে ড্রাইভারকে বলল, এবার গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল। এর বেশি কি কিছু দেখার আছে বন্ধু? পৃথিবীর অন্যত্র কি হচ্ছে অথবা হবে সেটা বড় কথা নয়, পৃথিবীর এই অংশে যা হচ্ছে তারই যে বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করলে, এ থেকেই শোষিত আফরিকার রূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারলে নিশ্চয়ই।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নানা পথ ঘুরে সন্ধ্যার আগেই বন্দর এলাকায় এসে পৌছাল।

অবসামবু একটা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল।

এবার ডিনারটা এখানেই সম্পন্ন করা যাক।

ডাক্তার জোনাস বলল, তা মন্দ নয়। কিন্তু মিসেস অবসামবু তোমার পকেট কেটে এভাবে প্লেজার ট্রিপ দেওয়া কি উচিত হবে?

কেন একথা মনে করছ ডাক্তারসাহেব। তোমরা অতিথি। দ্বিতীয়ত এদেশের কতটা অর্থ তোমাদের আছে। যা আছে তাতে তোমাদের পকেট খরচ চলাই কঠিন হবে। যা আছে তা সঞ্চয় করে রাখ। উদ্বৃত্ত যদি কিছু থাকে তাহলে বন্দর ছাড়বার আগে আমাকে দিয়ে যেও, তোমাদের ইচ্ছামত অন্য দেশের কারেন্সীতে বদল করে দেব।

কথা বলতে বলতে হোটেলে ঢুকল তিনজন।

টেবিল খালি ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আহার্য আর পানীয় দিয়ে গেল বেয়ারা।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

শহরের রাস্তায় রাস্তায় তখন আলোয় বাহার। সমুদ্রের বুক বেয়ে মিষ্টি নোনা বাতাসে দেহটা শির্‌শির্‌ করে উঠছিল সবাইয়ের। খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন তারা বাইরে এল রাত তখন নটা বাজতে বিশেষ বিলম্ব ছিলনা। পা দুটো শক্ত করে তারা এগিয়ে চলছিল। পানীয়ের গুণে অনেকটা অস্থির পদক্ষেপ।

জাহাজের সিঁড়িতে পা দিয়ে মীরচান্দানী বলল, অদ্ভুদ্‌।

কি অদ্ভুদ্‌।

অদ্ভুদ এই দেশ, অদ্ভুদ মহিলা অবসামবু, আরও অদ্ভুদ আমরা।

এখনও তো কিছুই দেখা হয় নি বন্ধু। তিন চারটে ভয়েজ করলে তবেই তুমি বুঝবে, জানবে, অনুভব করবে। আমাদের দেহটা যেমন ফিজিওলজির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। তেমনি সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র এই পৃথিবী। কোথাও কোন মিল নেই, আবার অমিলের মাঝ দিয়েই আমরা মিলনের সেতু গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করি। শেষ অবধি জোড়াতালি দিয়ে যা খাড়া করি তা সামান্য কারণেই তাসের ঘরের মত ভেঙ্গেও পড়ে।

রাইট্‌! রাইট্‌। ঠিক বলেছ ডাক্তার। সর্বত্রই কেমন একটা চাপা

কান্না। কোথাও গোঙ্গানি শোনা যায় কোথাও শোনা যায় না। এটুকুই পার্থক্য। আচ্ছা গুড্ নাইট্। শুভরাত্রি।

মীরচান্দানী জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল নিজের কেবিনের দিকে। ফিরেও তাকাল না ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার জোনাস মীরচান্দানীর এই মানসিক পরিবর্তনের কোন কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

মীরচান্দানী কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ বিছানায় কাত্ হয়ে শুয়ে রইল।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

মাঝ রাত পেরিয়ে যেতেই যেন হুঁস্ ফিরে পেল। জামা কাপড় বদল করে শিস্ দিতে দিতে স্নান ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা জলে আপাদমস্তক ভাল করে ধুয়ে ফিরে এল কেবিনে। তারপর সটান শুয়ে নিদ্রার আরাধনা করতে থাকে।

ঘুম নেই তার চোখে। তার কানে ভেসে আসছে অবসামবুর মন্তব্য, 'এই হল আফরিকার আসল রূপ'। পৃথিবী একটা বিরাট লেবোরেটারি। তারই প্রতিটি কোনায় কোনায় চলেছে সামাজিক অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিন্তু শেষ কথা আজও কেউ বলতে পারেনি। অথচ সবাই অপেক্ষা করছে শেষ কথা শুনতে, শেষ কাজ দেখতে।

মোম্বাসার দিনগুলো মন্দ কাটেনি। পকেটে যা ছিল সবই বিনা দ্বিধায় ব্যয় করে নিশ্চিন্ত মনে আবার জাহাজের নঙ্গর তুলে নিল জাহাজীরা। এবার গন্তব্যস্থল ডাকার। পথে মিষ্টি জল নিতে হবে কেপ টাউনে আর লুয়ান্দাতে।

কেপ টাউনে নামার অধিকার পায়নি মীরচান্দানী। একটা দিন জাহাজের কেবিনে বসে বসে কেটে গেল। মিষ্টিজল ভর্তি করে জাহাজ আবার রওনা হল। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে জাহাজ চলল উত্তর দিকে।

মীরচান্দানী ভাবছে। ভাবছে তুলনামূলকভাবে। ভাবছে পৃথিবীর গতিপথ ইতিহাসের গতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে।

দুই

"For fifteen years Moscow has been supplying military aid and training to pro-Soviet guarrillas, some of whom founded the **Popular Movement for the Liberation of Angola** (MPLA)". (Time)

ডাক্তার জোনাস গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন।

সামনে খোলা রয়েছে একখান বই। দৃষ্টি তার বইয়ের দিকে, মন যে তার কোথায় তা বাহির থেকে কারও জানার উপায় নেই।

সারা দিনের খাটুনি শেষ করে মীরচান্দানী অবাক হয়ে গেল ডাক্তার জোনাসের ধ্যান গম্ভীর মূর্তি দেখে। এগিয়ে গেল ডাক্তারের সামনে। নীচুগলায় ডাকল, ডাক্তার।

ডাক্তার জোনাস কোন জবাব দিল না।

ঘাবড়ে গেল মীরচান্দানী। ধীরে ধীরে ডাক্তারের গায়ে হাত রেখে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল, ডাক্তার জোনাস, কি ভাবছ?

সদ্য নিদ্রোত্থিতের মত ডাক্তার জোনাস ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মীরচান্দানীর মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছ বন্ধু?

তোমার তা হলে ধ্যানভঙ্গ হয়েছে দেখছি। কি ভাবছ?

ডাক্তার জোনাস খোলা বইখানা মীরচান্দানীর হাতে দিয়ে বলল, পড়।

মীরচান্দানী বইয়ে চোখ বুলিয়ে বলল, এভাষা আমার বোধগম্য নয়। তুমি পড়ে অনুবাদ করে শোনাও।

ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, অনুবাদ করা সহজ হবে না। মূল কথাটা তোমাকে বলতে পারব। এই বইটা হল 'অ্যাঙ্গোলার ব্যথা'—লিখেছেন ডাক্তার অগাস্টিনহো নেটো (Dr. Augustinho Neto). পেশাগত ভাবে ইনি একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্যসাধক কবি, সামাজিক জীবনে ইনিই হলেন বর্তমান অ্যাঙ্গোলার ভাবী ত্রাতা।

মীরচান্দানী যেন বুঝতে পারল না। একজন যিনি ডাক্তার, বিশেষ করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ তিনি সাহিত্য সাধক হতে পারেন, কিন্তু কেমন করে তিনি অ্যাঙ্গোলার ত্রাতা হবেন। বোধহয় চারণ কবি। গ্রামে-গঞ্জে শহরে হয়তবা অ্যাঙ্গোলার ব্যথা বেদনার কাহিনী শোনান, তাও কি সম্ভব একজন চিকিৎসকের পক্ষে।

মীরচান্দানী ডাক্তার জোনাসের পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, এটা কি? ঠিক বুঝলাম না।

জোনাস হেসে বলল, একটু গোলমেলেই বটে। ডাক্তার নেটো একজন সমর বিশারদ।

অদ্ভুদ! কবি এবং সমর বিশারদ! যে ব্যক্তি মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালবাসে, মানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপাসক সে-ই ব্যক্তি কি করে বন্দুক উঁচিয়ে নরহত্যা করে তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা ডাক্তার সাহেব।

তাও সম্ভব হয় যখন কোন ব্যক্তি মহত্তর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চায়। তাই কবির হাতের মসীও অসিতে পরিণত হয়। রক্তের অক্ষরে আদর্শের জয়গান তাকে লিখতে হয়। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে ডাক্তার নেটোর জীবনে। কেন সম্ভব হল, সেই কথা তিনি লিখেছেন তার এই বইকে। আমি পড়ছি আর অবাক হয়ে ভাবছি। দেশ ও স্বজাতিকে কতটা ভালবাসলে একজন কবি অলক্ষ্যে বন্দুক হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়।

মীরচান্দানী অবাক হয়ে গেল ডাক্তার জোনাসের কথা শুনে। শুনতে থাকে বইয়ের ঘটনা।

এক দিনের সামান্য একটা ঘটনা।

আমার ডাক্তারখানায় বসেছিলাম রুগীর প্রত্যাশায়। আমার সহকারী বাইরের টুলে বসে পথের দিকে তখন উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রুগীর প্রতীক্ষা করছিল। আমিও তেমনি শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আমি নতুন ডাক্তার। সবেমাত্র লিসবন থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়া শেষ করে এসেছি। পসার তখনও জমেনি। সেজন্য অধীর প্রতীক্ষা করতে হয় রুগীর প্রত্যাশায়। বিশেষ করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের আরও দুর্দশা। নেহাৎ অর্থবান ব্যক্তি ভিন্ন স্ত্রীদের চিকিৎসা করাতে কেউ আসে না। হয়ত কঠিন কোন রুগীকে নিয়ে নিম্নবিত্তের লোক আসে। অর্থ-উপার্জনের মাপকাঠিতে এসব রুগীকে চিকিৎসকরা সুচক্ষে দেখে না। আমি কিন্তু সকল রুগীকে সমানভাবে যত্ন নিতাম। অবশ্য রুগীর সংখ্যাও ছিল যৎসামান্য।

গ্রীষ্মকালের সকালে লুয়ান্দা শহর যতটা মনোরম অতটা মনোরম নয় মধ্যাহ্নে। সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পেলেই বাড়ি পালিয়ে যেতাম। বেশিরভাগ দিন-ই শূন্য পকেটে যেতে হত।

তখনও দুপুরের রোদ প্রখর হয় নি।

চুপ করে বসে বসে বিদেশী চিকিৎসাশাস্ত্রের ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। এমন সময় আমার সহকারী দ্য-কস্তা বলল সাহেব, একজন রুগী এসেছে।

বললাম, এখানে নিয়ে এস।

আমি ভুল বলেছি। রুগী আসেনি। রুগীর অভিভাবক এসেছে। আপনাকে রুগী দেখতে যেতে বলছে।

ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এস।

পরক্ষণেই একজন মধ্যবয়সী পর্তুগীজ ভদ্রলোক আমার চেম্বারে ঢুকলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ হয় নি। কাঁচা-পাকা চুল মাথায়।

স্বাস্থ্যবান ও সৌখীন। পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই পরিচ্ছন্ন। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সহজে কোন ইউরোপীয় কালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় না। শহরের ইউরোপীয় ডাক্তারের অভাব নেই। তাদের কাছে না গিয়ে আমার কাছে কেন এল। মনে মনে ভাবলাম, লিসবনের পর্তুগীজ সরকার তো অ্যাঙ্গোলাকে পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। উপনিবেশ ও উপনিবেশকারী দেশের মধ্যে পার্থক্য নেই। আজ বোধহয় সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এবং সেই দাবীকে প্রকাশ্যে প্রমাণ করতে ভদ্রলোক এসেছেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, বসুন।

না, বসবার সময় নেই। আপনাকে এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায়?

আমার বাড়িতে রুগী দেখতে।

মাননীয় মহাশয়ের নাম কি জানতে পারি?

অবশ্যই। আমি হলাম কাউন্ট আলফানসো দ্য মোরেস। হয়ত আমার নাম শুনে থাকবেন।

বললাম, নামটা শুনেছি। শুনেছি বড় জমিদার।

না, না। জমিদারী আমার বিশেষ নেই। এমন কি ক্রীতদাসের সংখ্যাও এমন কিছু নয়। জানেন তো, আমাদের, মানে অভিজাতদের আভিজাত্যের মাপকাঠি হল দাস-সংখ্যা। যাদের দাস যত বেশী তারা তত বড় অভিজাত এবং সমাজে সেই অনুপাতে মর্যাদালাভ করে। বর্তমানে কয়েকটা কোকো বাগিচা আছে আর কিছু ব্যবসা-পত্তর। নইলে বড় অভিজাত হবার মতো আর কিছু নেই।

আমি মনে মনে ভদ্রলোককে বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। যতই সুন্দর তার চেহারা হোক না কেন, তাকে কেন-বা মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিলাম না।

প্রশ্ন করলাল, কার অসুখ ?

একজন মহিলার।

আপনার কেউ হন ?

না ! কদিন হল আমার আশ্রয়ে এসেছেন। তাকেই দেখতে হবে।

একশ' পেসো দিতে হবে কাউন্ট।

একশ'! অবাক করলেন আপনি। ডাক্তার ফারনানদেজকে পঞ্চাশ পেসো দিলেই খুশী মনে রুগী দেখেন, আর আপনি চান একশ'। একটু বেশি হল না কি ?

মনে মনে বললাম, সাদার ওপর এটাই শোধ নেবার সুযোগ। নেহাৎ দায় না পড়লে এই মহাজনটি আমার পথও মাড়াতো না। এই তো সুযোগ।

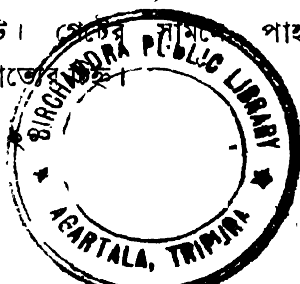
বললাম, আমি খুবই দুঃখিত কাউন্ট। আপনি ডাক্তার রোজারিও ফারনান্দেজের কাছেই যান। আমার পক্ষে একশ' পেসোর কম দক্ষিণায় মোটেই যাওয়া সম্ভব নয়।

কালো মানুষের দম্ভ সাদা মানুষরা সহজে সহ্য করে না। কাউন্ট অনেকক্ষণ ভেবে যখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হল তখন মনে হল, পেছনে কোন গুরুতর বিষয় আছে। নইলে কাউন্ট সম্মত হত না।

কাউন্টের গাড়ি ছিল রাস্তার উল্টো দিকে। কাউন্ট পথ দেখিয়ে তার গাড়িতে আমাকে বসাল। আমার পাশে সে নিজেও বসল। গাড়ি ছুটল উপনগরীর দিকে। রাস্তায় কোন কথা হল না। মাঝে মাঝে কাউন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। কাউন্ট খুবই গম্ভীর। কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে সে ভাবছিল। তার চিন্তায় বাধা দিতে ইচ্ছা হল না।

গাড়ি এসে দাঁড়াল বিরাট একটি প্রাসাদের সামনে।

বিরাট আঙ্গিনা। ফুলের বাগান। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ি। সামনে লোহার গেট। গেটের সামনে পাহারাদার। পাহারাদারের পোষাকে আভিজাত্যের চিহ্ন।


BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA

গাড়ির হর্ণ শুনেই পাহারাদার গেট খুলে দিল।

গাড়ি প্রাসাদের সামনে গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়াল।

একজন ভৃত্য দৌড়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

কাউন্ট গাড়ি থেকে নেমে আমাকে সাদর আহ্বান জানাল তার অনুগামী হতে।

দোতলা বাড়ির ঘরের পর ঘর পেরিয়ে দোতলায় উঠলাম। পশ্চিমদিকের কোণায় সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করে কাউন্ট বলল, ঐ যে খাট, ঐ খাটে আপনার রুগী শুয়ে আছে।

ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা একটি ইউরোপীয় যুবতী শুয়ে রয়েছে। চোখ বুঁজেই ছিল মহিলাটি। দূর থেকে বুঝতে পারছিলাম না মহিলাটি জেগে রয়েছে অথবা ঘুমিয়ে আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম।

রুগীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, রুগী মৃত।

অতি সন্তর্পণে চাদরের ভেতর হাত দিয়েই হাত বের করে বললাম, মহিলাটি মারা গেছেন। প্রাণের কোন স্পন্দন আর নেই।

কাউন্ট মৃদু হেসে বলল, আমি জানি।

জেনে কেন আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন।

মহিলাটির গর্ভপাত ঘটাতে আজ সকালেই মারা গেছে।

এর সৎকার না করে আমাকে কেন ডেকে এনেছেন?

তুমি বড্ড বেশি প্রশ্ন করছ ডাক্তার। গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি নিজেই। জারজ সন্তানের জ্বালা থেকে বাঁচতে গিয়ে মেয়েটার প্রাণ গেছে।

আমার তো কিছু করণীয় নেই কাউন্ট।

আছে। তোমার কিছু করণীয় আছে বলেই ডেকে এনেছি। আমরা ক্যাথলিক। গর্ভপাত ঘটানো আইন বিরুদ্ধ। স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দরকার।

বললাম, আপনি কি আমাকে দিয়ে মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখাতে চান?

মিথ্যা! হো-হো করে হাসল কাউণ্ট।

হাসি থামিয়ে বলল, এটাই প্রথম নয় ডাক্তার। নারী-দেহের ওপর আমার প্রবল লালসা অনেক মেয়েকে টেনে এনেছে এই প্রাসাদে। তাদের অনেককেই সন্তান হত্যা করতে হয়েছে এই একই উপায়ে।

আমি চমকে উঠে বললাম, সর্বনাশ!

সর্বনাশ নয়। এটাই চিরাচরিত ঘটনা। স্বাভাবিক। তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।

আমি অপারগ। বুঝতে পারলাম সহজে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ খোলা নেই। চাতুর্যের সাহায্য নিতে হল। বললাম, আমার কাছে সার্টিফিকেট লেখার কাগজ নেই। সাদা কাগজে লিখে দিতে পারি।

কাউণ্ট কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, বেশ তাই হবে। তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা দিলেই হবে। টেবিলের ওপর কাগজ আছে লিখে দাও।

লিখে দিলাম।

হাঁ লিখেছিলাম। যা লিখেছিলাম তার মূল কথা হল, রুগীকে দেখেছি। আমার উপস্থিতির পূর্বেই সে মারা গেছে। বোধহয় হৃদপিণ্ডের কোন ব্যাধি ছিল। সই করলাম। রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলাম।

মিথ্যা সার্টিফিকেট যে নেয় তারও জানা দরকার সার্টিফিকেটে সবটাই মিথ্যা থাকা সম্ভব। আমি হাতের লেখা গোপন করে এমন ভঙ্গীতে লিখলাম যা কোন কালেই আমার লেখা বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা বদলে দিলাম। তাড়াতাড়িতে কাউণ্ট এসব লক্ষ্য করে নি। আমার হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত নয়; সেজন্য হাতের লেখা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগও নেই। রেজিস্ট্রেশন নম্বর তো কারও জানা সম্ভব নয়।

একশ' পেসোর নোট পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কাউণ্টের গাড়িতেই ফিরে এলাম চেম্বারে। প্রথম কাজ হল পুলিশকে খবর দেওয়া। বে-নামে টেলিফোন করে পুলিশকে ঘটনাটা জানালাম।

পরবর্তী ঘটনা আরও কৌতুকজনক।

পুলিশ পৌঁছবার অনেক আগেই মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়েছিল। সেজন্য মৃতদেহ তোলার হাঙ্গামা করা হলেও সেই দিন অপর একটি মেয়ের মৃতদেহ কবর থেকে তোলা হয়েছিল। মূল মৃত দেহটা আর তোলা হয় নি শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে। পোস্টমর্টেমে স্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট পেয়ে পুলিশ শান্ত হল, কিন্তু শান্ত হল না কাউণ্ট স্বয়ং। এই ঘটনা তো বহুজন জানে না। জানে সে নিজে আর জানি আমি। পুলিশের হাঙ্গামা হতেই তার ধারণা হল, পুলিশকে আমি-ই খবর দিয়েছি।

আমি ভেবেছিলাম, ঘটনার এখানেই ইতি।

ভাবনার সঙ্গে ঘটনার পার্থক্য অনেক বেশি।

সেদিন সবেমাত্র সন্ধ্যা পেরিয়েছে। আমি রুগীর আশায় চেম্বারে বসে আছি। এমন সময় বিরাট একটি পুলিশ-বাহিনী ঘেরাও করল আমার চেম্বার। সার্চ করল। তারপর কোন অজ্ঞাত কারণে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

থানায় পৌঁছেই বুঝতে পারলাম, কাউণ্টের চক্রান্তে আমি রাজদ্রোহী নামে চিহ্নিত এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী হয়েছি।

পড়া বন্ধ করে মীরচান্দানী ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, এটা কি সম্ভব? একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে চক্রান্তের জালে এ ভাবে জড়ানো কি ন্যায়সম্মত?

ডাক্তার বলল, তোমার প্রশ্ন দুটো। প্রথমটির উত্তর হল, সম্ভব; দ্বিতীয়টির উত্তর হল, ন্যায়সম্মত না হলেও এমনটা ঘটে থাকে যারা ঘটায় তারা স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি, ন্যায়-ধর্মের মাথায় পদাঘাত করেই এই ঘটিয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার

ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিরা বিনা দ্বিধায় এই কাজ করে থাকে। আরও শুনতে থাকো। ডাক্তার নেটোর ওপর এর কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল সেটাও জেনে নাও।

ডাক্তার জোনাস আবার পড়তে থাকে।

আমি জানি না কেন আমাকে গ্রেপ্তার করেছে অথচ আমি বন্দী। আমার মানসিক অবস্থা অনুমানযোগ্য। প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছু সময় প্রয়োজন হয়েছিল। আমি কালো মানুষ। আমাকে কালোদের বন্দীশালায় রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য পর্তুগীজরা প্রচার করত, তাদের উপনিবেশগুলো পর্তুগালের অংশ এবং উপনিবেশের অধিবাসীরা সমান অধিকারের অধিকারী।

হায়রে কাগুজে প্রচার! কালোর জন্য যে নিকৃষ্ট ব্যবস্থা ও ভিন্ন-ধরণের ব্যবহার সঞ্চিত ছিল তা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করলাম লুয়ান্দার কারাগারে। পর্তুগীজদের আইনও আলাদা। তাদের প্রেসিডেন্ট সালাজারের ইচ্ছাই আইন। সাধারণ লোকের প্রতিবাদ করবার কোন অধিকার নেই, প্রতিবাদকারীর নির্যাতন অপরিহার্য।

সত্য বলার অধিকার হরণ-ই শেষ নয়। মিথ্যার ওপর অর্ধ সত্যের প্রলেপ দিয়ে বাস্তবকে বিকৃত করার কলা-কৌশলে পর্তুগীজ শাসকদের মত পটু অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদীরা নয়।

পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বাগাড়ম্বর সর্বদেশেই স্বীকৃত রাষ্ট্রনীতি।

পর্তুগীজ শাসকরা বিশেষ করে তাদের উপনিবেশে এই স্বীকৃত রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কোন সময়ই কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি রাখে নি। আসল ও নকল চিনে নেবার সাধ্য ছিল না সাধারণ মানুষের।

আমি এই অপরাষ্ট্রনীতির শিকার হয়েছি।

জেলখানার অপর কালো কয়েদীদের যে মর্যাদা আমারও মর্যাদা তদ্রূপ। আমার আহার্য আর তাদের আহার্যের কোন তফাৎ নেই।

তবুও তারা জানে দশ অথবা বিশ বছর পর তারা মুক্ত আকাশের তলায় নিঃশ্বাস নিতে পারবে। আমি জানি না, কবে আমি ফিরে যাব খোলা ময়দানে, অন্তত খোলা বাতাসে বুক ভর্তি করব।

আমিই একমাত্র ব্যক্তি নয় আমার মত হাজার হাজার অসহায় নিরপরাধ কালো মানুষ বিগত পাঁচশত বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপীড়ন সহ্য করেছে অ্যাঙ্গোলার মাটিতে। এইসব কালো মানুষের বুকের রক্ত শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদীদের ঐশ্বর্যের অট্টালিকা তৈরী করতে হয়েছে। বিনিময়ে তারা পেয়েছে অনাহার, মৃত্যু, বেত্রাঘাত, অঙ্গহানি। এদের কথা কোন ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় নি। এদের জন্য শোকাশ্রুপাত করতে এগিয়ে আসেনি কোন স্বাধীন-দেশের মানুষ, এদের জন্য নীরবে গোপনে তপ্ত অশ্রুপাত করেছে এদের স্বজন। উচ্চস্বরে কাঁদতে পারেনি, ক্রন্দনের আওয়াজ শুনে ছুটে যদি আসে শোষক-শাসকরা তাহলে তারও কণ্ঠস্বর নীরব হবে চিরকালের জন্য।

আমি বন্দী। নির্জন একটি কক্ষে আমি-ই একমাত্র আমার সঙ্গী। দেহের সঙ্গী মন, মনের সঙ্গী দেহ। তত্ত্বাবধায়করা দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখে যায় আমি জীবিত আছি কিনা। খাদ্য পরিবেশনকারী যেন বাঘের খাঁচায় খাবারের থালা প্রবেশ করিয়ে বাহির থেকে খাদ্যদ্রব্য ঢেলে দেয় সেই থালায়। এই খাদ্যের বেশ একটা অংশ মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে, কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে হয় সেই খাবার।

কক্ষের দেওয়ালের পাশে ছোট্ট একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্রের পাশেই মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা। দু তিন দিন পর মেথর এসে জল ঢেলে দিতো। যখন বাহির থেকে জল ঢালত তখন আমার শয্যার কম্বলখানা বগলে করে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত এক পাশে। সম্পূর্ণ পরিষ্কার হত না কোন দিনই। দুর্গন্ধে হাঁপিয়ে উঠতাম। আমি নিরুপায় বন্দী।

এইভাবে আরও কতবছর কাটত তা বলা কঠিন।

সুযোগ এল আমার সামনে।

রাত দুটো কিংবা আড়াইটে।

হঠাৎ আমার সেলের দরজা খোলার শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। শুনেছিলাম, ফাঁসির আসামীকে শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে নিয়ে যায়। আমার কেমন সন্দেহ হল। পর্তুগীজ শাসকদের আইন নামক বস্তুটিকে মর্যাদা দান নীতি বিরুদ্ধ। গোপন বিচারে আমার অজ্ঞাতে হয়ত ফাঁসীর আদেশ হয়েছে। তাই আমার ঘুম ভাঙ্গানো হয়েছে। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম।

টর্চের আলোতে দেখতে পেলাম জেল অধিকর্তা আর কয়েকজন পাহারাদার।

একজন পাহারাদার আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, উঠ। সাহেব এসেছে কথা বলবে!

উঠে বসলাম।

জেল অধিকর্তা বেশ বয়স্ক লোক। খাস পর্তুগীজ। হৃষ্টপুষ্ট দেহ। একদিন-ই তাকে দেখেছি। এবার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আমি জানি, আমাকে মরতেই হবে, তখন আর কেন এদের প্রতি বিনয় ব্যবহার করব। আমি কোন কথা না বলে ভাল করে কম্বল জড়িয়ে নিয়ে বসলাম, কি কথা?

জেল অধিকর্তা নরম গলায় বলল, আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। আমার একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।

আমি অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে বসলাম।

কি কাজ? বেশ রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

আমার সঙ্গে অফিসে চলুন, সেখানে কথা হবে।

বললাম, আপনার ইচ্ছা।

পাহারাদার পরিবৃত হয়ে জেল অফিসে হাজির হওয়া মাত্র জেল অধিকর্তা পাহারাদারদের বিদায় করে আমাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে অপর একটি চেয়ারে নিজে মুখোমুখী বসে অনেকক্ষণ আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার মেয়ে থাকে শোয়াঙ্গাতে। সেখানে আমার জামাতার বিরাট খামার। কয়েক ঘণ্টা আগে খবর এসেছে আমার মেয়ে লিসা খুবই পীড়িত। সন্তান সম্ভাবনা, প্রসব-কাল উত্তীর্ণ। একজন সার্জেনের প্রয়োজন। অবশ্য গাইনোকলজিতে দক্ষ সার্জন দরকার।

আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। বাধা দিয়ে বললাম: আমার তো কিছু করার নেই। আমি বন্দী।

জেলের অধিকর্তা গম্ভীরভাবে বলল, এতো আমার জানা আছে।

শহরে অনেক সার্জেন আছে।

তারা বিশেষ ধরণের এই চিকিৎসায় পারদর্শী নয়। আমি সংবাদ পেয়েছি এই চিকিৎসায় আপনি সিদ্ধ হস্ত।

সিদ্ধ হস্ত কি না তা বলা কঠিন। আমি তো রুগী দেখিনি। তবে আমার কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন ?

আমি আপনাকে আমার মেয়ের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চাই।

আমি বন্দী। কেন বন্দী জানেন ? কোন এক কাউন্ট আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এক রুগীর চিকিৎসার জন্য। তারপর সে এক বিভৎস ঘটনা। এই কাউন্ট বহু নারী ধর্ষণ করে কৃতবিদ্য লোক। একটি যুবতী ছিল রক্ষিতা। তার গর্ভপাত ঘটাতে মৃত্যু ঘটিয়েছিল। কাউন্ট আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেট লেখাতে। আমি অস্বীকার করি নি, তবে মিথ্যা সার্টিফিকেট মিথ্যা লোকের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব। আমিও মিথ্যা নাম-ধাম দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম তারই পরিণতিতে আজ আমি বন্দী।

জেলের অধিকর্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এটাও আমি জানি। আমার আর বিলম্ব করার সময় নেই। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

আমি অক্ষম। প্রথমত আমি বন্দী। দ্বিতীয়ত আমার কোন অস্ত্র নেই, কোন যন্ত্র নেই। তৃতীয়ত আমি আপনাদের অবিশ্বাস করি। চতুর্থত আমি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করেছি।

দেখুন ডাক্তার নেটো, লিসা আমার একমাত্র সন্তান। তাকে বাঁচাতে আজ আমি সাহায্য চাইছি। এর জন্য আমি গভর্ণরের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি আনিয়েছি। এই চিকিৎসার দায়িত্ব নিলে আমি আপনাকে দু হাজার পেসো দেব, যদি মেয়ে আমার সুস্থ হয় তা হলে আরও তিন হাজার পেসো দেব। দয়া করে এই চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আমি কেমন একটা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করছিলাম। হেসে বললাম, টাকা দিয়ে আমি কি করব। আমি বন্দী আমার টাকার কি প্রয়োজন। আমি সব সহ্য করেছি, আত্মবিক্রয় সহ্য করতে পারবনা মঁসিয়ে। আমাকে ক্ষমা করুন। অন্য কোন ব্যবস্থা করুন।

অন্য কোন কারণ ঘটলে সেদিন নির্ঘাত আমার দণ্ড ছিল কঠিন বেত্রাঘাত কিন্তু সেদিন জেল অধিকর্তা নিজে বিপন্ন। আজ নতজানু হয়ে তাকেই আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হচ্ছে। কালো মানুষ চিরকাল ওদের করুণাপ্রার্থী, আজ সব কিছু-ই উল্টো।

জেল অধিকর্তা গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বন্দীত্ব মোচনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। লিসা আমার একমাত্র সন্তান তাকে বাঁচাতে আপনার করুণা পেতে চাই।

হেসে বললাম, একটা প্রাণ বাঁচাতে এত আপনার কাকুতি কিন্তু পাঁচশত বৎসর ধরে কত প্রাণ আপনারা নষ্ট করেছেন তা কি জানা নেই। তাদেরও বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন আপনাদের পায়ে ধরে কত আকুতি-মিনতি জানিয়েছে। কই! আপনাদের হৃদয়ে তাদের আবেদন একবারও স্পর্শ করে নি তো!

তা হলে যাবেন না?

আমি গম্ভীরভাবে চিন্তা করে বললাম, হঁা যাব। একটি সর্তে।

কি সর্তে?

রুগীর জীবন সম্বন্ধে আপনাকে কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারব না।

আমি যখন চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করব রুগীকে বাঁচিয়ে তোলার সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বও নেব, শুধু মৃত্যুকে রোধ করতে অপরাগ হলে তার দায়িত্ব নেব না।

জেল অধিকর্তা চিন্তিত। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি ভাববেন না, আমার বিদ্যাবুদ্ধি মত তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। এটা বন্দী নেটোর কথা নয়। এটা ডাক্তার নেটোর প্রতিশ্রুতি। চিকিৎসক তার ধর্মচ্যুত হবে না। আমি প্রস্তুত।

গায়ের কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে জেল অধিকর্তার পেছন পেছন গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটল দ্রুত বেগে।

তারপর খোলা মাঠের মাঝ দিয়ে পথ।

চারিদিক নিস্তব্ধ। আশে পাশে কোন জনপ্রাণী নেই। কোথাও ঘন বন। তারই মাঝ দিয়ে গোঁ-গোঁ করে ছুটছে গাড়ি। জেল অধিকর্তা মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখছে আর আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। রাত শেষ হতে আর বিশেষ দেরী নেই।

দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হতে থাকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর কত দূর?

প্রায় এসে গেছি। আর মাইল কুড়ি। রোদ উঠবার আগেই পৌঁছে যাব।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, কেন আমি রাজি হলাম। জেল অধিকর্তার করুণ মুখ অথবা তার একমাত্র সন্তানের জীবন রক্ষার তাগিদে? অনেকক্ষণ ভেবে কোন উত্তর পেলাম না। তবে আমি একথা জোর দিয়েই বলতে পারি সেদিন জেল অধিকর্তার অনুরোধ রক্ষার পেছনে আমার কোন মহৎ উদ্দেশ্য অথবা মহানুভবতা ছিল না। আটমাস এগার দিন নির্জন সেলে বাস করার পর সাময়িক মুক্তি-লাভের আশায় আমি সম্মত হয়েছিলাম। আবার খোলা আকাশ দেখব। আবার বুকভর্তি নির্মল বাতাস টেনে নেব, আবার স্বাধীনভাবে চলাচলকারী মানুষের মুখ দেখতে পাব। এইটুকু লাভের আশায় আমি সম্মত হয়েছিলাম।

সকাল হল।

আকাশে সূর্যের প্রথম অরুণিমা দেখা দিল। আমি গাড়ির জানালা দিয়ে পূবের আকাশের চেহারা দেখছি। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখি একটা খামার বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

গাড়ির শব্দে একজন পর্তুগীজ যুবক ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। তার কথায় বুঝলাম সেই জেল অধিকর্তার জামাতা।

ডাক্তার এসেছেন সঙ্গে? এখনও লিসা জীবিত আছে।

হাঁ।

কোথায়?

জেল অধিকর্তা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এইতো।

আমার পরিধানে বন্দীর পোষাক। তার ওপর জেলখানার কম্বল জড়ানো। আমাকে দেখে যুবক বিশ্বাস করতে পারল না। অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল আর ভাবছিল। জেল অধিকর্তা জামাতার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, আর দেরী কর না। তোমাদের ডাক্তার আছেন কি? যন্ত্রপাতি আছে কি?

যুবকটি শুধুমাত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি জেল অধিকর্তার পেছন পেছন চললাম খামার বাড়ির দিকে। পেছন পেছন যুবকটি আসছিল।

জেল অধিকর্তা চলতে চলতে বলল, একটু ভুল হয়ে গেছে। আপনার পোষাক পরিচ্ছদ বদলে আনা উচিত ছিল। তখন অত ভাববার অবসর ছিল না।

বললাম, ঠিকই। তবে পোষাক বদল করতেই হবে। রুগীর সামনে কয়েদীর পোষাকে যেতে পারব না। মানসিক কোন অশান্তি ঘটলে রুগী মারা যেতে পারে। চিকিৎসকের পোষাক অনেক সময়

রুগীর মনে আশার সঞ্চার করে। তাতে রুগীকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

অবশ্যই। কথা শেষ হবার আগেই আমরা বাড়িতে প্রবেশ করলাম। জেল অধিকর্তা জামাতাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতেই তাড়াতাড়ি সে আমার পোষাক বদলের ব্যবস্থা করল।

ঘড়িতে দেখলাম এক ঘণ্টা সকাল পেরিয়ে গেছে।

রুগীর ঘরে ঢুকলাম।

স্থানীয় চিকিৎসক একজন পর্তুগীজ। তার কাছে রিপোর্টগুলো দেখলাম। রক্তের চাপ, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন, নাড়ী সব দেখে বললাম, আর বিলম্ব নয়। ডাক্তার প্রস্তুত হোন। খুবই বিলম্ব হয়ে গেছে। রুগীকে বাঁচানো কঠিন হবে। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি পত্রটা নিয়ে আসুন আমি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

স্থানীয় চিকিৎসক তখুনি অনুমতি পত্র আনতে গেলেন। আমিও প্রস্তুত হয়ে নিলাম। গত আট মাস যাবত হাতে ছুরি-কাঁচি ধরিনি, কেমন অনভ্যস্ত নিজেকে মনে হল। তবুও মন শক্ত করে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। ইতিমধ্যে অনুমতিপত্র নিয়ে হাজির হলেন স্থানীয় চিকিৎসক। বললাম, আর দেরী নয়। আপনি ক্লোরোফর্মটা ধরুন। আমি কাজ আরম্ভ করছি। একবার লিসার মুখের দিকে তাকালাম। তখন সে যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে অবশ হয়ে গেছে।

তারপর করুণ কাতরধ্বনি।

কাজ শেষ করতে সাড়ে চার মিনিট সময় দরকার হয়েছিল।

সেলাই শেষ করে স্থানীয় চিকিৎসককে বললাম, অপারেশন সফল হয়েছে। বেবীও জীবিত। নাড়া ঠিক চলছে কিনা ভাল করে দেখুন।

অনেকক্ষণ নাড়ী দেখে স্থানীয় চিকিৎসক বললেন, অনিয়মিত।

ইনজেকশান চাই। একটা কোরামিন। আছে। দিন. ইনজেকশান দিন? এখনও হার্টের অবস্থা সচল, আশা আছে।

আবার কেমন হতাশ হয়ে পড়ছি। এই সাংঘাতিক অপারেশনের ধাক্কা সামলাতে পারবে কি শেষ পর্যন্ত! তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। লড়াই চলেছে রুগী নিয়ে। বাইরে অধীর প্রতীক্ষা করছে লিসার স্বামী ও বাবা।

কানে ভেসে এল, রুগী কেমন?

কোন উত্তর দিলাম না।

স্থানীয় ডাক্তার বলে এলেন কোন কথা বলবেন না। রুগী অবজারভেশনে আছে। একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে।

রুগীর অবস্থা খুব ভাল নয় তবুও জ্ঞান হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

একবার মাত্র শোনা গেল উঁ, রুগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।

এবার স্থানীয় ডাক্তারকে ডেকে বললাম, এবার আপনার কাজ। আমি জীবিত অবস্থায় আপনার হাতে তুলে দিলাম। এবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করুন।

বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে লিসার স্বামী ও পিতা।

আমাকে দেখেই তারা এগিয়ে এল।

প্রশ্ন, কেমন আছে রুগী?

বললাম, জ্ঞান হচ্ছে, তবে নির্ভয় হওয়ার মত সময় এখনও হয় নি।

অর্থাৎ জীবনের আশঙ্কা আছে।

নাই বলতে পারি না। অপারেশনটা আরও একদিন আগে হওয়া উচিত ছিল। বড় দেরী হয়ে গেছে। আমি ঔষধপত্র লিখে দিয়ে এসেছি। সেইমত সেবা যত্ন করুন। আপনাদের মেয়ে সুস্থ হবার শতকরা নব্বইভাগ সম্ভাবনা। হে যুবক বন্ধু, তুমি পিতৃত্বলাভ করেছ। তোমাদের আনন্দময় জীবন কামনা করি।

সারারাত ঘুমোতে পারিনি খেতেও পাইনি। বড়ই ক্লান্ত।

জেল অধিকর্তা সে সব বুঝেই তাড়াতাড়ি কোকো রুটির ব্যবস্থা

করলেন। খেয়েদেয়ে পোষাক পরিচ্ছদ বদল না করেই একটা সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গল।

তাকিয়ে দেখলাম আকাশ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ডাক্তার, ডিনার প্রস্তুত।

ডিনার! মনে মনে হাসলাম। কতদিন ডিনার খাইনি। বড় বড় সৌভাগ্য আমার।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেতে গেলাম।

খাবার টেবিলে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, রুগী কেমন?

জ্ঞান হয়েছে। কথা বলছে।

তা হলে আর ভয় নেই। তবে নড়াচড়া বন্ধ। খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আপনি কি কয়েকটা দিন এখানে থাকতে পারেন না?

যুবকটির প্রশ্নে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। বললাম, আমি বন্দীশালা থেকে এখানে এসেছি। আবার বন্দীশালায় আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার থাকা না-থাকা নির্ভর করছে আপনার শ্বশুরের ওপর। তিনি কোথায়? লুয়ান্দা গেছেন। আজই ফিরবেন। তার সঙ্গে কথা বলুন। আজ রাতটা এখানেই আছি।

পরদিন সন্ধ্যায় জেল অধিকর্তা ফিরে এলেন। বড়ই বিমর্ষ তিনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, আজ রাতেই কি আমাকে ফিরতে হবে বন্দীশালায়?

জেল অধিকর্তা বললেন, না। আপনাকে আর আমাদের কারাগারে ফিরতে হবে না। গভর্ণর বাহাদুর আমার বিশেষ অনুরোধে আপনাকে মুক্তি দিতে স্বীকার করেছেন। আদেশপত্রও দিয়েছেন, কিন্তু।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

জেল অধিকর্তা অনেকক্ষণ নিজের মনে খেতে থাকেন। হঠাৎ

বললেন, একটি সর্ত আরোপ করেছেন। খুব কঠিন নয়। তবে আপনার পক্ষে কঠিন, আমাদের পক্ষে মর্মান্তিক।

কি সর্ত?

সর্ত। সেটা হচ্ছে, সাতদিনের মধ্যে আপনাকে আঙ্গোলা পরিত্যাগ করে যেতে হবে। পর্তুগীজদের কোন উপনিবেশে আপনার স্থান হবে না।

অর্থাৎ নির্বাসন।

অর্থ তাই। আপনার দেশ ছেড়ে যেতে হবে, কষ্ট হবে, আর আমরা আপনার মত পারদর্শী একজন চিকিৎসকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব।

জেল অধিকর্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাবারের প্লেট সরিয়ে রাখলেন।

আমার পক্ষে এই সংবাদ যেন কিছুই নয় এমন ভাব দেখিয়ে নীরবে আহারকার্য সমাধা করতে থাকি। খাওয়া শেষ করে জেল অধিকর্তার মুখের দিক তাকিয়ে বললাম, সংবাদটি মোটেই শুভ নয়। তবুও আমি এই সর্ত মানতে রাজি। কারণ আমি হব মুক্ত। তবে ম'সিয়ে, এই দেশেই আমি ফিরে আসব এবং গৌরবের মুকুট মাথায় নিয়ে আসব।

আর কেউ খুশী হোক আর না হোক আমি খুশী হব।

আজ থেকে সাতদিন?

না, আগামী কাল থেকে সাতদিন।

বলতে বলতে জেল অধিকর্তা পকেট থেকে সরকারী আদেশনামা বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি পড়লাম, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, তাই ভাল!

পাঁচটা দিন কাটল সেই খামার বাড়িতে।

লিসা তখন উঠে বসতে পারে। তার নবজাত শিশুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সন্তর্পণে বুকের দুধ খাওয়ায়। সকালে বিকালে একবার করে লিসা আর তার শিশুকে দেখে আসি। আর কোন কাজ নেই সামনে। সারাদিন কাটে পুরাতন ম্যাগাজিন পাঠ করে।

পাঁচটা দিন কাটাবার পর বললাম, এবার বিদায় দিন আপনারা।

সবারই চোখ ছল ছল করে উঠল, সবাই জানতে চাইল, কোথায় আমি যাব।

বললাম, জানিনা। এই বিশাল পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও আমার জন্য দু ফুট জমি খুঁজে পাব পা রাখবার মত।

জেল অধিকর্তার জামাতা আমার হাতে গুঁজে দিল ব্যাঙ্ক নোটে দশ হাজার পেসো।

বললাম, এত টাকা দেবার কথা ছিল না।

জানি। পাঁচ হাজার পেসো বেশি দিলাম যাতে নির্বাসনের প্রথম ধাক্কায় আপনি আর্থিক কারণে ক্ষত বিক্ষত না হন। নতুন করে গুছিয়ে নিতে আপনার টাকার দরকার হবেই। সেই জন্যই টাকার ব্যবস্থা করেছি।

আমি খুশী মনে টাকা পকেটে তুলে নিলাম।

এখন কোথায় যাবেন ?

লুয়ান্দায় যাব। সেখানে অনেক কাজ। কাজগুলো একদিনের মধ্যে শেষ করে প্লেনের টিকিট কাটব মনে করেছি।

আমার গাড়ি প্রস্তুত।

চলুন লিসাকে শেষবারের মত দেখে আসি।

লিসার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি সুস্থ হয়েছ, এবার আমার ছুটি।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লিসা, কোন কথা বলতে পারছিল না। তার লালচে ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিলো।

বললাম, তবে আসি।

আমার জীবন দাতা, বলেই লিসা থেমে গেল। তার চোখের কোণ তখন ভিজে উঠেছে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। ধীরে ধীরে গাড়িতে এসে বসলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভুলে গেলাম। আমি ডাক্তার, আমার ভাবাবেগ থাকা উচিত নয়।

আবার পাহাড় বন প্রান্তর পেরিয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে লুয়ান্দায় পৌঁছলাম। সেদিন সমুদ্র ছিল উত্তাল। ঝড়ের ঝাপটায় শহর মাঝে মাঝে যেন কেঁপে উঠছে। বৃষ্টি তখনও শুরু হয় নি।

আমার গাড়ি এসে দাঁড়াল পুরাতন চেম্বারের সামনে। দেখলাম চেম্বারের দরজায় তালা ঝুলছে। মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা যেদিন কাউন্ট আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে।

আজ যেন সবই নতুন মনে হচ্ছিল। আট নয় মাসে লুয়ান্দা শহরের পরিবর্তন না হলেও মানুষগুলোর যেন কত পরিবর্তন ঘটেছে। আমার পরিচিত কাউকেই দেখতে পেলাম না আশে পাশে। তারা বোধহয় ডাক্তার নেটোর কথা ভুলেই গেছে। কেমন অসহায় মনে হল নিজেকে।

গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

চললাম বাবা-মায়ের সন্ধানে।

আমাকে হঠাৎ ফিরে পেয়ে আনন্দ মুখরিত হল গৃহের সবাই কিন্তু আনন্দ স্থায়ী হয় নি। আমার মুখে যখন শুনল নির্বাসনের কথা তখন সবাই বিমর্ষ না হয়ে পারল না। তবুও আমি যে মুক্ত হয়েছি এই আনন্দ নির্বাসনের পরওনার চেয়ে বেশি মূল্যবান।

বিদায় জন্মভূমি, বিদায়! বলতে বলতে পরদিন প্লেনে উঠে বসলাম। গন্তব্য স্থল ব্রোজোভাইল। পুরাতন কঙ্গোর রাজধানী।

কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করেছে।

কিন্তু! একি! ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি! ক্ষমতা লিপ্সায় ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন শিবিরে আস্তানা নিয়েছে। আবার পশ্চিমী শক্তি প্রগতিশীল দলকে গদীচ্যুত করতে বিরুদ্ধ দলকে শুধুমাত্র অর্থ ও অস্ত্র দিয়েই সাহায্য করছে না, তারা ভাড়াটিয়া সৈন্য পাঠিয়েছে লড়াই করতে। কঙ্গোর ভাগ্যে যে দুঃখের কালিমা আঁকা হবেই

তা বুঝতে বিলম্ব ঘটল না। আমি অনুধাবন করতে থাকি অবস্থাগুলো। শুধু ভাবছি কালো মানুষগুলো কত আহাম্মক। পশ্চিমী শক্তি দেশত্যাগের সময় এমন বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে যাতে সহোদর ভাইয়েরাও পরস্পরকে আর বিশ্বাস করতে পারছেনা। একে অপরের রক্তে হাত রাঙিয়ে ক্ষমতালাভের নেশায় নেমেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার খেলা কঙ্গোতেও চলছে।

আমরাও তো সাম্রাজ্যবাদীর কবলে। যদি কোনদিন পর্তুগীজ শাসক-শোষকরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় তখনও তো তারা এইভাবে আমাদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে ঠেলে দেবে।

এতদিন চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, কখনও রাজনীতির কথা ভাববার অবসর পাই নি। প্রয়োজনও হয় নি। এবার মনে হচ্ছে আফরিকার কালো মানুষদের মুক্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভেই সমাপ্ত হবেনা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক উন্নত চিন্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন। সে কাজের পথে কেউ তো অগ্রসর হতে পারছে না। তবুও মনে হয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় তখনই অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ পাওয়া যাবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

তবুও ভেবেছি, কিন্তু এর সঙ্গে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের সূত্র ঠিক করতে হলে প্রয়োজন জনমত গঠন। জনসাধারণের সহায়তা ভিন্ন কোনক্রমেই কোনরূপ স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। প্রয়োজন জন সংগঠন।

আমার সহ-কয়েদী ব্রাণ্ট্।

কোন সময় মনিবের গুদাম থেকে আধ বুশেল যব চুরির অপরাধে তার আট বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। এই লোকটি আমার সেলের দরজার ওপার থেকে খাবার ছুড়ে দিত রোজ। এর সঙ্গেই মাঝে

মাঝে দু'চারটে কথাও হত। অতি সামান্য কথা। মনের কথা নয়।

এই কালো মানুষটা কিছু যেন বলতে চায়। বলতে পারে না। বলবার সুযোগও ছিল না। আটমাস যাবত লোকটা এসেছে নিজের কথা একটাও বলে নি। একদিন মাত্র বলেছিল, তার মুক্তি লাভের দিন অনেক দূরে।

তখন ব্রোজোভিলের রাস্তায় লড়াই চলছে। আমরা সবাই সন্ত্রস্ত। আমার বাসস্থানে কোন হাঙ্গামা ছিল না। একদিন সন্ধ্যা বেলায় হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। চমকে উঠলাম। দরজা খুলব কি খুলব না ভাবছি। বাহির থেকে কাতর-মিনতি দরজা খুলে দেবার। অনিচ্ছা থাকলেও কোন লোক বিপন্ন হয়েছে মনে করে সাহস করে খুললাম দরজা। আমার হাতের টর্চের আলোতে দেখলাম যাকে, সেই হল আমার কয়েদী-জীবনের আহার্য পরিবেশনকারী ব্রাণ্ট্।

বিস্মিত ভাবে বললাম, ব্রাণ্ট্!

হাঁ। ডাক্তার সাহেব! আমি ব্রাণ্ট্। বাইরে বড়ই গোলমাল। কিছুক্ষণ আশ্রয় চাই। গোলমাল কমলেই চলে যাব। আপনি এখানে কেন ডাক্তার সাহেব?

দেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি এখানে কেন?

আমি, বলেই ব্রাণ্ট্ থেমে গেল। কেমন একটা ভীতির ছাপ ফুটে উঠল তার মুখে।

তাকে ডেকে নিয়ে গেলাম আমার শোবার ঘরে। গরম জল ছিল। তাড়াতাড়ি এক কাপ কোকো তৈরী করে দিলাম। এমন সদয় ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত নয় ব্রাণ্ট। আমার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে কোকোর পেয়ালা খালি করে ভাল করে চেপে বসল আমার বিছানায়।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখানে কি ভাবে এসেছ। জেল পালিয়ে এসেছ বুঝি?

না ডাক্তার সাহেব। সরকার একটা ফর্মান জারী করেছিল।

সেই ফর্মানে ছিল, যারা জওয়ান পুরুষ তারা যদি বেলজিয়ামের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কঙ্গোতে লড়াই করতে চায় তা হলে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। আমি সেই ফর্মান অনুসারে ভাড়াটিয়া দলে নাম লিখিয়েছিলাম। আমার মত কয়েক শত বন্দী নাম লিখিয়েছিল। আমরা সবাই কয়েকদিন আগে কঙ্গোতে এসেছি, কড়া পুলিশ পাহারায়। আমাদের ট্রেনিং দেবার ক্যাম্পে রেখে গেছে। সেখানেও কড়া পাহারা। কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে এলেও শাস্তি নেই। চারিদিকে চোরাগোপ্তা গুলি চলছে। কোন রকমে পালাতে পালাতে এখানে এসে পৌঁছেছি।.

অভিনিবেশ সহকারে তার বক্তব্য শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এবার স্পষ্ট বুঝলাম আফ্রিকার মানুষের মুক্তি সু-দূরপরাহত। পশ্চিমীশক্তি দেশ ছেড়ে গেলেও তারা অশান্তি জিইয়ে রাখতে বদ্ধ-পরিকর। পশ্চিমী শক্তির স্বার্থ বজায় রাখতে অশান্তি সৃষ্টির চক্রান্ত সু-পরিকল্পিত।

বললাম, তোমরা কজন পালিয়ে এসেছ?

সংখ্যা ঠিক বলতে পারি না, তবে তিরিশ জনের কম নয়।

তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে?

কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার মত তারাও হয়ত আত্মগোপন করেছে। খুঁজে দেখতে পারি।

যেমন করে হোক তাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। আমি শীগ্‌গীরই কঙ্গো নদীর পূর্ব তীরে গভীর জঙ্গলে একটা গোপন আস্তানা তৈরী করব। সেখানে সবাইকে আশ্রয় দেব।

ব্রাণ্ট্‌ অবাক হয়ে গেল আমার কথা শুনে।

বললাম, কোন চিন্তা নেই ব্রাণ্ট্‌। আমরা কঙ্গোর জন্য এখানে আসি নি। আমরা এসেছি নিজেদের জন্য। তুমি যেমন মুক্তি পেতে চাও তেমনি মুক্তি পেতে চায় গোটা দেশের মানুষ। তাদের মুক্তির

পথ খুঁজে বের করতে হবে। আমার একার পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। সবার সমবেত চেষ্টায় তা সম্ভব। অ্যাঙ্গোলার মাটিতে বসে যা করা সম্ভব নয় তা সম্ভব কঙ্গোর মাটিতে বসে।

ব্রাণ্ট্ সব কথা বুঝতে পেরেছিল কি না জানি না, তবে পরবর্তীকালে ব্রাণ্ট্ আমার বক্তব্যই অন্যের সামনে যুক্তি দিয়ে তুলে ধরে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল তার অনুগামীদের।

পরদিন সকাল বেলায় ব্রাণ্ট্ বেরিয়ে গেল। সারাদিন আর ব্রাণ্টের দেখা পাই নি। ভাবলাম, ব্রাণ্ট্ বোধহয় পালিয়ে গেল, আমার সংসর্গ তার বোধহয় প্রীতিকর হয় নি। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল তখনও ব্রাণ্টের দেখা নেই। রাতের খাওয়া শেষ করে সবেমাত্র শুয়েছি এমন সময় দরজায় আওয়াজ হল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলেই দেখি ব্রাণ্ট্ সামনে দাঁড়িয়ে সঙ্গে আরও আটজন।

আমাকে দেখেই ব্রাণ্ট বলল, আর সবাইকে পেলাম না ডাক্তার সাহেব। তবে দু'চারদিন চেষ্টা করলে প্রায় সবাইকে পাব।

সবাইকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকি, তোমার কেন জেল হয়েছিল?

প্রথম জন থতমত খেয়ে নীচু গলায় বলল, মেরেছিলাম সাহেব।

কাকে মেরেছিলে?

খামারের মালিক ডি-কোস্তা সাহেবকে।

তোমার কেন জেল হয়েছিল?

দ্বিতীয় জন উত্তর দিতে পারছিল না।

আবার জিজ্ঞাসা করতেই প্রথম জন উত্তর দিল, নারী-ধর্ষণের অপরাধে।

এমনি ভাবে সবার পরিচয় নেবার পর মনস্থির করলাম, একমাত্র জঘন্য অপরাধে যারা অপরাধী তাদের বাদ দিয়ে অন্য সবাইকে আমার গোপন আস্তানায় পাঠাব। অন্যান্য যারা অপরাধ কবুল করল তাদের অধিকাংশই পেটের ক্ষুধার তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য

হয়েছিল, অথবা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা খুন-জখম করেছিল। এদের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে, জেলের কষ্ট-দায়ক জীবন আর পরবর্তী কালের আতঙ্কপূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা কেমন অসহায় করে তুলছিল তাদের।

উৎসাহ দিলাম।

নতুন জীবনের স্বপ্ন তুলে ধরলাম তাদের চোখের সামনে।

বুঝিয়ে বললাম, নিজের দেশের মুক্তি আনতে জীবন-যৌবন-ধন-মান সব কিছু বিসর্জন দিতে হবে। কঙ্গোতে যারা লড়াই করতে এসেছে তারা পশ্চিমী শক্তির স্বার্থ রক্ষা করে কঙ্গোর কালো মানুষদের জন্য চিরকালের দাসত্ব-বন্ধন চায়। এদের কোন মহৎ চিন্তা নেই, মহৎ কাজের প্রেরণা নেই। শুধুমাত্র অর্থের লোভে বুকের রক্ত দিতে এসেছে। যদি মরতেই হয়, তা হলে দেশের মুক্তির জন্যই মরতে হবে, দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যই মরতে হবে।

কয়েক দিন তাদের সঙ্গে থেকে প্রতিটি খুঁটি-নাটি বিষয় বুঝিয়ে বলে স্বমতে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। তারপর একদিন একমাত্র নারী-ধর্ষণকারীকে বাদ দিয়ে বাকি কজনকে নিয়ে আমি সেই দুর্গম গোপন স্থানের অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম কঙ্গোর ডামাডোলের বাজারে প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে। এই সময় আমাদের ওপর নজর দেবার মত এক জনকেও পাওয়া যাবে না। আমরা সতর্কতার সঙ্গে যদি এগিয়ে চলতে পারি কারও কোন সন্দেহ জাগবে না, কেউ প্রশ্ন করবে না, অথচ আমরা সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

কঙ্গো নদীর অববাহিকার পূর্ব তীর। নদী এখানে গভীর ও প্রশস্ত। গভীর বন। বিপদ-সঙ্কুল ও ভীতিপ্রদ। কোন গ্রাম নেই পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে। নদীর একটা খাড়িতে নৌকা বেয়ে বনের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। আমরা আটজন এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌছলাম। সভ্য জগতের সঙ্গে

সম্বন্ধ হীন এই স্থানে আফরিকার কালো মানুষদের কোন বিপদ নেই। অশান্তি নেই। এখানেই আমার প্রথম কর্মক্ষেত্র। আমার সহচর মাত্র সাতজন। আটজন মানুষের পক্ষে অ্যাঙ্গোলার মুক্তি ঘটানো অলীক স্বপ্ন। চাই আরও জনসংখ্যা, যথেষ্ট অস্ত্র।

এক দিনের মধ্যেই নিজেদের নিরাপদ আস্তানা গড়ে নিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে বসলাম।

ব্রাণ্টকে ডেকে বললাম, আমাদের আরও লোক চাই। হাজার হাজার আত্ম-উৎসর্গকারী লোক চাই, যারা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত। তোমার কাজ হবে সংগঠন গড়ে তোলা। স্বার্থত্যাগী উচ্চমনা মানুষের দলই পারে স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বস্ব ত্যাগ করতে। এমন মানুষের সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমার। যারা মৃত্যুকে ভয় করে, যারা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে একান্ত হয়ে বাস করে, যারা ভূমির মায়াতে ব্যক্তি-স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে না, যারা আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিতে পারে না, যাদের সামাজিক নীতিবোধ নেই, তারা এই মুক্তিযুদ্ধের সামিল হবার অযোগ্য। সেই জন্য সংগঠনে বাছাই করা মানুষ দরকার।

ব্রাণ্ট্ আমার সঙ্গে একমত। দায়িত্ব মাথায় পেতে নিল।

তোমার কাজ হল সংগঠনের সবাইকে গড়ে তোলা, বুঝলে ফার্দিনান্দ। কিন্তু তার আগে দরকার যথাযথ সামরিক শিক্ষা। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সামরিক শিক্ষা লাভ করেছে। সে জন্য তোমাদের মধ্যে যারা সামরিক শিক্ষা লাভ করেছে তাদের একজনকে ক্যাম্প থেকে এখানে আনতে হবে। এই কাজও তোমাকে করতে হবে ফার্দিনান্দ।

জবাব দিল সেকুকু। বলল, আমাদের অস্ত্র চাই ডাক্তার সাহেব। অস্ত্র কোথায় পাব। পর্তুগীজরা সামরিক শিক্ষায় যেমন শিক্ষিত তেমনি তাদের অঢেল অস্ত্র। এই অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করতে হলে উপযুক্ত অস্ত্র প্রয়োজন।

বললাম, হবে। আমি চেষ্টা করছি। আমার সঙ্গে সেকুকু যাবে। অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে আমি যেখানে যাব, সেখানে তোমাকে যেতে হবে। সেখানে ট্রেনিং হবার পর যারা যারা লড়াইয়ের উপযুক্ত হবে তাদের হাতে উপযুক্ত অস্ত্র দেবার দায় আমার। আমরা আটজনে আজ নতুন দল গড়লাম, নতুন আদর্শের জন্য জীবন পাত করার শপথ নিলাম। আজ থেকে আমাদের এই নতুন দলের নাম হবে Popular Movemeht for the Liberation of Angola, অল্প কথায় এর নাম হবে MPLA, যত দিন দেশ স্বাধীন না হবে তত দিন আমাদের অন্য কোন চিন্তা নেই, অন্য কোন উপাস্য দেবতা নেই, অন্য কোন ভোগ-বিলাস নেই।

ব্রাণ্ট্, ফার্দিনান্দ আর সেকুকুকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ব্রাণ্ট আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পরদিন সকালেই। ফার্দিনান্দকে আস্তানার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেকুকুকে সঙ্গে নিয়ে কদিন পরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের এই যাত্রাও অনিশ্চিত।

আমাকে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। তাকে হতে হবে কোন একটা বৃহৎ শক্তি। এদের সাহায্যেই আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমার সমমতাবলম্বী নিকটবর্তী দেশ একমাত্র মোজাম্বিক। সেখানে কোন প্রকারে আশ্রয় নিতে পারলে আমার সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সেকুকুকে সঙ্গে নিয়ে আবার দুর্গম যাত্রা আরম্ভ হল। দশদিন পরে আমরা পৌঁছলাম জাম্বিয়ার সীমান্তে। রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে চললাম রাজধানীর দিকে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত অর্থহীন অবস্থায় পৌঁছলাম।

পরের দিন থেকেই আমাদের চেষ্টা হল রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করা।

কয়েক দিনের চেষ্টায় আমরা সফল হলাম কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে হতাশা দেখা দিল।

রুশ রাষ্ট্রদূত কোনরূপ আশ্বাস দিতে পারলেন না। সোভিয়েত সরকারের সমর্থন না পেলে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় তাও বললেন।

আমি বললাম, বেশ। আপনি আমাদের মস্কো যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা সোভিয়েত নেতাদের সামনে আমাদের আবেদন রাখব। তারা যদি অসম্মত হয়, তাতে আমাদের বলার কিছু নেই কিন্তু এখানে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে থাকা উচিত হবে না।

রাষ্ট্রদূত প্রথমে রাজি হল না। অবশেষে বললেন, আমি সংবাদ নিয়ে দুদিন পর আপনাদের জানিয়ে দেব।

দুদিন পরে আমরা জানতে পারলাম, সোভিয়েত সরকার আমাদের মস্কো যেতে অনুমতি দিয়েছে। আমরা যেন যে কোন সময় রওনা হতে পারি, সেই প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ পেলাম।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় ইলুশিয়ন ১৮ চেপে আমি আর সেকুকু রওনা হলাম মস্কো অভিমুখে। সেই রাত্রেই আমরা মস্কোর বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করা মাত্র সোভিয়েত সরকারের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্বাগত জানালেন।

হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জাহাজের বাঁশী বিপদ সঙ্কেত জানাল। মীরচান্দানী ও ডাক্তার উভয়েই চমকে উঠে বই বন্ধ করে কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়াল।

জাহাজীরা তখন ছোটাছুটি করছে। ক্যাপটেনকে দেখা গেল উপরের ব্রিজে। প্রথমে মনে হয়েছিল কোন ঝড়-তুফান। আকাশের দিকে তাকিয়ে সবাই আশ্বস্ত হল, না ঝড়-তুফান নয়। তা হলে কি? সবাইয়ের চোখে জিজ্ঞাসা। উত্তর দিতে পারে একমাত্র ক্যাপটেন

আর রেডিও অফিসার। অচিরেই জানা গেল, জাহাজের বিশেষ একটি যন্ত্র বিকল হয়েছে। অবিলম্বে মেরামত প্রয়োজন। আটলান্টিকের ওপর ভরসা করে এই জাহাজ ভাসানো নিরাপদ নয়। নিকটবর্তী কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেই হবে।

কিন্তু নিকটবর্তী বন্দর তো লুয়ান্দা। তাও হাজার কিলোমিটার। সেখানে নিরাপত্তা নেই সবাই জানে। অথচ দ্বিতীয় কোন নিকটবর্তী আশ্রয় নেই। ক্যাপটেনের মুখে বিপদের গুরুত্ব জেনে সবাই সম্মত হল লুয়ান্দায় জাহাজ ভেড়াতে। ইতিমধ্যে সাহায্য চেয়ে S-O-S পাঠানো হয়েছে। চারশ কিলোমিটারের মধ্যে কোন জাহাজ থাকলে উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই আসবে। বিপন্ন জাহাজকে রক্ষা করতে অ-মিত্র দেশের জাহাজও ছুটে আসে। মিত্র এবং অ-মিত্রের কোন ভেদাভেদ থাকে না তখন।

মীরচান্দানী রেডিও অফিসারের কেবিনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, নিকটে কোন জাহাজ আছে কি মিস্টার রোজারিও?

রেডিও অফিসার রোজারিও হেসে বলল, অনেক জাহাজ আছে। সংবাদ সবাই পেয়েছে। আশা করছি কোন বিপদ হবার আগেই একটা রাশিয়ান জাহাজ পৌঁছে যাবে। একশ' কিলোমিটারের মধ্যেই আছে এই জাহাজ, আরও কিছু দূরে আছে নরওয়ের একখানা মালবাহী জাহাজ। সেটাও এগিয়ে আসছে। দেখা যাক আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

মীরচান্দানী তার প্রথম ভয়েজের অভিজ্ঞতাকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে বিশেষ শঙ্কিত হল। ছুটতে ছুটতে ইনজিন রুমে নেমে গেল।

দ্বিতীয় ইনজিনিয়ার মিসাউদি ইনজিন বন্ধ করে চুপ করে বসেছিল একটা লোহার টুলের ওপর। মীরচান্দানীকে দেখে ইসারায় ডাকল।

কি অবস্থা মিস্টার মিসাউদি?

প্রপেলার ভেঙ্গেছে। ইনজিন বন্ধ করে দিয়েছি। অবিলম্বে মেরামত করতে না পারলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

জাহাজ ডুববে কি ?

না। ভাসতে ভাসতে কোথায় যাবে তার ঠিকানা নেই। মিস্টার রোজারিও বলল, সাহায্যকারী জাহাজ এসে যাবে।

সেটাই ভরসা, বলেই মিসাউদি সিগারেট ধরাল। জাপানী এই অফিসার কম করেও আঠার বার সারা পৃথিবী পরিভ্রমন করেছে। নানা বিপদের সম্মুখীনও হয়েছে, কোন সময়ই তাতে ভীত হয় নি। আজও সে নির্বিকার ভাবে এই বিপদকে গ্রহণ করেছে। একটা সিগারেট মীরচান্দানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই হল জাহাজের জীবন। মাটির জীব আর জলের জীবের পার্থক্য এইটুকু মাত্র। আমরা মৃত্যুকে সামনে রেখেই জাহাজে ভাসি। সবার অলক্ষ্যে কখন যে মৃত্যু আমাদের হাতছানি দেবে তা আমাদের স্রষ্টাও জানে না। তবে বহু বিপদ অতিক্রম করেছি মীরচান্দানী। সে সবের তুলনায় এতো সামান্য ঘটনা। ভয় পাওয়ার মত কোন ঘটনা এখনও ঘটে নি।

মীরচান্দানীর চোখে-মুখে কেমন একটা উদাসভাব। মিসাউদির কথাগুলো তার কানে প্রবেশ করল কি না তা বুঝা গেল না।

তিন

"Unfortunately, for Angola, the country is potentially too rich and too strategically important to be left alone to work out its own future"—N. Ashford.

খুব ভোরেই ঘুমটা ভেঙ্গে সাও মারিয়ার হাত বাড়িয়ে দেখল সাও কনস্টান্স বিছানায় নেই।

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সাও মারিয়া কনস্টান্সের বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল। সোহাগ ভরা অধরোষ্ঠ রাঙ্গিয়ে দিয়েছিল কনসটান্স গভীর চুম্বনে। শোবার আগে কোন ক্রমেই জানতে পারে নি কনসটান্স যাবে। এইভাবে প্রতিদিন যেমন নিশ্চিন্তে তারা দুজন বাহুবন্ধনে আত্মহারা হয়ে ঘুমিয়েছে আজও তেমনি ঘুমিয়েছিল।

অথচ আজই প্রথম ঘুম ভেঙ্গে মারিয়া লক্ষ্য করল কনসটান্স ঘরে নেই। ঘরের দরজা বাহির থেকে তালা বন্ধ। মারিয়াকে একা রেখে রাতের বেলায় কনসটান্স কখনও বাইরে যায় নি। আজ বাইরে যাবার আগে সেইজন্যই বোধ হয় বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া পাশ ফিরে শুলো। অবিন্যস্ত পোষাক জড়িয়ে নিল সারা দেহে।

তখনও তার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব।

তবুও মনে পড়েছিল পুরনো দিনের কথা।

কনসটান্স এসেছিল তার গ্রামের বাড়িতে আহত অবস্থায়।

সারা পৃথিবীতে তখন পরাধীন জাতিরা স্বপ্ন দেখছে স্বাধীনতা

লাভের। আফ্রিকার কালো মানুষরা ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে। অ্যাঙ্গোলার মানুষরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব অথচ সালাজার সরকার কোন মতেই তার বজ্রকঠিন বাঁধন থেকে অ্যাঙ্গোলাকে মুক্ত করতে রাজী নয়। এমন সময় উত্তর অ্যাঙ্গোলার শিক্ষিত সমাজের সামনে দেখা দিল একজন প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা যুবক। নাম তার হলডন্ রোবের্টো। শিক্ষায় দীক্ষায় বুদ্ধিতে বাগ্মিতায় রোবের্টো অনন্য সাধারণ। বড় ঘরের ছেলে। অর্থের ও আভিজাত্যের গরিমা আছে। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে তার স্থান।

রোবের্টো স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার স্বপ্ন দেখছিল। কোন ক্রমে যখন পর্তুগীজ শাসন মুক্ত হবার পথ পেল না তখন সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্নে সে মেতে উঠল। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরল স্বাধীনতার অমোঘ বাণী, তাদের বুঝিয়ে দিল, পশু শক্তির আশ্রয় না নিলে কোন পশু শক্তিকে বিতাড়ণ করা সম্ভব নয়।

আফরিকার কালো মানুষ শত শত বৎসরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। তাদের শোণিত কণিকায় রয়েছে দাসত্বের মানসিকতা। তারা ভীত হল সশস্ত্র বিপ্লবের কথা শুনে। স্থানীয় দাঙ্গা হাঙ্গামা করা যত সহজ তত সহজ নয় শক্তিশালী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা। এদের না ছিল সামরিক শিক্ষা, না ছিল সামান্যতম অস্ত্র। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষ পরাধীনতার জ্বালায় ক্ষুব্ধ, কিন্তু তখনও তারা ক্ষিপ্ত হতে পারে নি।

রোবের্টো বুঝেছিল মুক্তি পাগল মানুষদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সামিল করতে হলে যে সংগঠন দরকার তা তার নেই। রোবের্টো ছুটে গেল তার ভগ্নীপতি মোবুতুর (Mobutu) কাছে।

কঙ্গো ভেঙ্গে দুটো রাজ্য হয়েছে। বৃহদংশের নাম জাইরে (Zaire)। সেই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মোবুতু। রোবের্টো তার ভগ্নীপতির সমকক্ষ হতে চায়, সে চায় অ্যাঙ্গোলা থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতির আসন অলঙ্কৃত করতে।

প্রস্তাবটা মোবুতুর সমর্থন লাভ করল।

মূল প্রশ্ন হল পর্তুগীজদের হাত থেকে অ্যাঙ্গোলাকে মুক্ত করা।

এই কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য প্রয়োজন দল গঠন। রোবের্টো নতুন দল গঠন করল, নাম দিল, National Liberation Front, অল্প কথায় F N L A. দল গঠনের জন্য আর্থিক দায়িত্ব নিল মোবুতু। শুধু তাই নয়, এই দলকে অস্ত্র সজ্জিত ও সুশিক্ষিত করার দায়িত্বও নিল মোবুতু। অবশ্য জাইরের সামরিক সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। তাই কাজ খুব অগ্রসর হতে পারে নি।

আশার বাণী শোনা গেল শীঘ্রই।

মোবুতু চীনের সঙ্গে মিতালি স্থাপন করেই অ্যাঙ্গোলার সমস্যা তুলে ধরল চীনের সামনে। দুষ্ট পর্তুগীজ শাসন অবসানের জন্য চীনের আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

একষট্টি সাল থেকেই রোবের্টো বোকোনসো সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল অ্যাঙ্গোলার উত্তর অংশে। জাইরে থেকে শিক্ষা লাভ করে রোবের্টোর সামান্য সংখ্যক অনুগামী গেরিলা পদ্ধতিতে পর্তুগীজ শাসকদের বিব্রত করতে থাকে অবিশ্রান্ত ভাবে। মোবুতুর সঙ্গে চীনের মিতালি নতুন আশার সঞ্চার করল রোবের্টোর মনে। তিয়াত্তর সালে রোবের্টো গেল পিকিং-এ।

চীন থেকে এল দুই শ সামরিক উপদেষ্টা। তারা আশ্রয় গড়ে নিল জাইরেতে। এখানে বসেই রোবের্টোর অনুগামীদের সামরিক শিক্ষা দিতে থাকে চৈনিক উপদেষ্টারা এবং মোবুতুর মারফত আসতে থাকে চীনের অস্ত্র।

ভুল করে সবাই। রাজনীতি আর সমরনীতিতে সামান্য ভুল করলে স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটা অসাফল্য আসে তার হদিস জানা ছিল না রোবের্টোর।

ডাক্তার নেটোর আশ্রয় মস্কো।

রোবের্টোর আশ্রয় পিকিং-এ।

বৃহৎ শক্তির অন্যতম আমেরিকা তো নীরব দর্শক থাকতে পারে না। অ্যাঙ্গোলার খনিজ তেল, ইউরেনিয়ম, অন্যান্য খনিজ সম্পদ তদুপরি আটলান্টিক তীরে বহু বন্দর, এইগুলির ওপর রাশিয়া অথবা চীনের প্রাধান্য থাকবে, এটা অসহনীয় আমেরিকার পক্ষে। বিশেষ করে নিকটবর্তী নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফরিকার সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিগুলোও বিপন্ন হবে যদি অ্যাঙ্গোলায় রাশিয়া অথবা চীনের মুষ্টি শক্ত হয়। এবার আমেরিকা এল রঙ্গমঞ্চে।

বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিল।

কনসটান্স ছিল FNLA-এর সমর্থক ও সামরিক শক্তির একটি স্তম্ভ। জাইরে সীমান্তে তার বাড়ি। স্থানীয় উপজাতিদের সে পরিচালক।

রোবের্টোর সঙ্গে ডাক্তার নেটোর সংযোগ রক্ষা করার সে পক্ষপাতী।

কিন্তু মোবুতু চায় MPLA-দলের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা প্রসার যাতে না হয়। তার জন্য রোবের্টোর সঙ্গে ডাক্তার নেটোর মিতালি অথবা যোগাযোগ সে চায় না; মোবুতু ডাক্তার নেটোর ক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করে ভীত। রোবের্টোর প্রভাব একমাত্র জাইরে সংলগ্ন অ্যাঙ্গোলার উপজাতিদের মধ্যে। রোবের্টোর শক্তি বৃদ্ধির আশায় মোবুতু হাত বাড়াল দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার নেতা জোসেফ সাভিমবির দিকে। সাভিমবিও এগিয়ে এলো রোবের্টোর সহায়তায়।

পর্তুগীজ শক্তি তখন বিপর্যস্ত।

উত্তরে FNLA, মধ্যভাগে MPLA এবং দক্ষিণে সাভিমবি।

মার্কিন হস্ত প্রসারিত হল সাভিমবির দিকে। দক্ষিণ আফরিকার সাহায্য পেত সাভিমবি। অচিরে নীতিগতভাবে রোবের্টোর এবং সাভিমবির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। রোবের্টো পেত চীনের সাহায্য। সাভিমবি পেত দক্ষিণ আফরিকার তথা মার্কিন সাহায্য। অতএব বিরোধ হল অবশ্যম্ভাবী। সাভিমবি রোবের্টোর দল ছেড়ে

নতুন দল গড়ল Union for the Total Independence of Angola, অল্প কথায় UNITA, এদের মূল সমর্থক হল মার্কিন ও আফরিকা।

এদিকে পিকিং থেকে যারা এসেছিল রোবের্টোকে সাহায্য করতে তারা মোবুতুর অনিশ্চিত মনোভাব ও রোবের্টোর সুবিধাবাদী নীতিকে পছন্দ না করে পঁচাত্তর সালের শেষের দিকে জাইরে পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে গেল।

এই ডামাডোলের সময় কনসটান্স জোড়াতালি দিয়ে তিনটি বিপ্লবীদলকে একমুখী করার চেষ্টায় নেমেছিল রঙ্গভূমিতে।

অন্ধকার রাত্রে গোপনে চলাচল করত উত্তর থেকে দক্ষিণে। হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সংযোগ সৃষ্টি করত। বৃথাই তার চেষ্টা। সাহায্যকারী বৃহৎ শক্তি দুটো তাদের নীতি চাপিয়ে দিয়েছে নেতাদের মগজে। কোন আশাই নেই আর মিলনের।' অ্যাঙ্গোলার মত বৃহৎ দেশে বিপ্লব ঘটানো সহজ কথা নয়। বিশেষ করে বিভিন্ন আদর্শবাদী দল উপদলের ঐক্য না ঘটাতে পারলে আরও বহুকাল দাসত্ব কায়েম থাকবে এ-বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনটি দলের নেতারা কিন্তু নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার কোন চিন্তাই করত না।

কনসটান্স সবচেয়ে বিপন্ন হল সাভিমবির একগুঁয়েমিতে।

কনসটান্স সাম্রাজ্যবাদীদের কবলমুক্ত দেশগুলোর উদাহরণ তুলে ধরে যতই বুঝাতে চেষ্টা করেছিল সাভিমবি ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল।

দেখ মঁসিয়ে, ফরাসীরা ইন্দোচীন পরিত্যাগ করে যাবার সময় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে গিয়েছিল যার ফলে এক যুগের বেশি কাল অবধি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে সেখানে। ভিয়েতনামকে বিভক্ত না করলে এই অবস্থা নিশ্চয়ই ঘটত না। বিশেষ করে পশ্চিমী শক্তির আশ্রয় নিলে দেশে অরাজকতা, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ

অবাধে চলবে। ক্ষমতার লড়াইতে কে জয়লাভ করবে তা বলা কঠিন। পশ্চিমী শক্তির সাহায্যপুষ্ট কোন ক্ষমতাদর্পী আজ অবধি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে নি।

কনসটান্সের বক্তব্য সাভিমবির মনে কোন রেখাপাতই করল না। অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, বেশ, তোমার কথা স্বীকার করলাম। কিন্তু বিকল্প কি? আমরা কি কম্যুনিষ্টদের হাতে দেশকে তুলে দেব? তা হতে পারে না। তার চেয়ে লড়াই করে নিজ নিজ আদর্শমত আমার প্রয়োজন হলে দেশকে ভাগ করে নেব।

আমার মনে হয়, অ্যাঙ্গোলার তিনটি স্বাধীনতাকামী দলের একত্র হয়ে লড়াই করা উচিত। তারাই স্থির করবে কোন ধরণের শাসনতন্ত্র অ্যাঙ্গোলার পক্ষে উপযুক্ত।

সে তো অনেক দূরের কথা। ডাক্তার নেটো আশ্রয় নিয়েছে রাশিয়ার। কম্যুনিষ্ট প্রভাব রয়েছে তার ওপর। আবার রোবের্টো নিয়েছে পিকিং-এর আশ্রয়। পিকিং উগ্র কম্যুনিষ্ট। আমি তো রোবের্টোর সঙ্গী ছিলাম। FNLA প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই আমি ছিলাম তার সহকারী কিন্তু রোবের্টের মতিগতি মোটেই ভাল নয়। সেজন্যই তাকে পরিত্যাগ করে নতুন দল গড়তে হয়েছে। আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে বলেই দল গড়তে হয়েছে।

কনসটান্স গম্ভীর ভাবে বলেছিল, তা নয় মঁসিয়ে। ক্ষমতার লোভ তোমাদের উন্মাদ করেছে। আর এই লোভ জাগিয়েছে বিদেশী শক্তি। হানাহানি করব আমরা। মরব আমরা, টাকার পাহাড় জমবে বিদেশীর কোষাগারে। এটাই কি আমাদের কাম্য। আমরা শত্রু নিপাতের জন্য বিদেশী সাহায্য নেব। নিজেদের তথাকথিত আদর্শ রক্ষার জন্য তাদের সাহায্য নেব না। এটাই আমাদের নীতি হওয়া উচিত।

সাভিমবি ব্যঙ্গ করে বলল, অনেক নীতিকথা শুনেছি বন্ধু। আমরা চাই স্বাধীনতা, সেই সঙ্গে আমরা চাই গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র-

ব্যবস্থা। ডাক্তার নেটো অথবা রোবের্টো কেউ-ই আমাদের সঙ্গে এক মতাবলম্বী নয়। সে জন্য কোন ঐক্য সম্ভব নয়।

বিশালদেহী সাভিমবি দাড়িতে হাত বুলিয়ে অনুযোগের সুরে বলল, তার চেয়ে ডাক্তার নেটো আর রোবের্টোর কাছে যাও। তাদের বুঝিয়ে বল আমার সম-মত পোষণ করতে। তা হলে ঐক্যবদ্ধ কাজ সম্ভব হবে।

কনসটান্স ফিরে এসেছিল ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে। কল্পনায় সে দেখতে পেল বিচ্ছিন্ন অ্যাঙ্গোলার চিত্র আর সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত দুঃখ-দুর্দশার ছবি।

রোবের্টোর কাছে ফিরে এসে আরও হতাশ হল সে।

এটা কি নির্ভুল? প্রশ্ন তুলেছিল কনসটান্স।

কোনটা? প্রশ্ন করল রোবের্টো।

পিকিং তার সাহায্য উঠিয়ে নিয়ে গেল অথচ তুমি নির্বিকার।

আমার পক্ষে মোবুতুর সাহায্য বেশি মূল্যবান। মোবুতু বুঝতে পেরেছে পিকিং যা করেছে, বা করবে তার পেছনে থাকবে অ্যাঙ্গোলায় কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করা। মোবুতু তা চায় না। মোবুতু কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার বিরোধী। জাইরেকে উন্নতিশীল করতে মার্কিন সাহায্য প্রয়োজন। সেই সাহায্য পেতে হলে পিকিং-এর কুক্ষিগত থাকা সম্ভব নয়। আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য মোবুতু আগ্রহী এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করছে। এর জন্য তার নিজের দেশের সর্বনাশ তো করতে পারে না। উপরন্তু আমরাও মার্কিন সাহায্য পাব। আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে।

কনসটান্স মাথায় হাত দিয়ে বসল। অনুচ্চস্বরে বলল, সর্বনাশ!

কেন?

তুমিও সিয়ার খপ্পরে পড়েছ। জাপান কোরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা কোরিয়ার দক্ষিণ অংশ দখল করে রেখেছিল, আর উত্তরাংশ ছিল সোভিয়েত প্রভাবে। এর পরিণতি

যে কত ভয়ঙ্কর হয়েছিল, তা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে। কোরিয়াতে আর ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদীরা যা করেছে, তা তোমার অজানা নয়। দুটো বৃহৎ শক্তি মুখোমুখী লড়াই করে না ঠিকই, কিন্তু তাদের অনুগত সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে কি ভাবে হানা-হানি করে তা তোমার অজানা নয়। আমরা বোধ হয় এই অবস্থাকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। একবারের জন্যও পরিণতির কথা চিন্তা করছি না।

রোবের্টো তার কালো মুখখানা আরও কালো করে বলল, অ্যাঙ্গোলা বিভক্ত হোক তাতে আপত্তি নেই। বিভক্ত অংশের মানুষ নিজেদের সুবিধামত সরকার গঠন করুক। তবুও তাদের ওপর কোন মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া সহ্য করব না। এটাই আমি চাই। এতে তোমার মত না থাকার কোন যুক্তি নেই মনে হচ্ছে।

কনসটান্স ব্যর্থতার বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, তবুও হাল ছাড়ল না। ছুটে গেল লুসাকায়। সেখানে ডাক্তার নেটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একই যুক্তি উত্থাপন করল। কোন ফল হল না। ডাক্তার নেটো বলল, হাঁ আমরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করি ঠিকই। আমরা কম্যুনিষ্টদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা সোভিয়েতের ক্রীড়নক নই। (Despite the MPLA's depending on Communist support and its marxist Oriented policies it is not simply an instrument of the Soviet Union—N. Ashford). আমাদের নিজস্ব নীতি ও কর্মধারায় সোভিয়েতের কোন প্রভাব নেই, তাদের ইচ্ছানুসারে আমার দল MPLA পরিচালিত হয় না। আমরা মেহনতী মানুষের জন্য স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার স্বপ্ন দেখি।

নিষ্ফল কনসটান্সের দৌত্য।

তবুও কনসটান্স তার দল ছাড়তে পারে নি। রোবের্টোর পাশে থেকে লড়াই করতে হয় তাকেও। সমর বিষয়ে পরামর্শ দিতে হয়েছে।

সে এক নিস্তব্ধ রাতের ঘটনা।

ক্যাম্পে সবাই তখন ঘুমে অচৈতন্য। পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে FNLA গেরিলারা। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কনসটান্স স্বয়ং।

রাত শেষ হয়ে এসেছে।

এমন সময় গর্জে উঠল বন্দুক কামান। গভীর বনে পাতার ছাউনীর তলায় পরিশ্রান্ত গেরিলারা সুপ্তিমগ্ন। তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়েই দেখল, পর্তুগীজ সৈন্যরা মশাল জ্বেলে বনের নির্দিষ্ট অংশটা ঘিরে ফেলেছে। বের হবার পথ নেই। সম্মুখ যুদ্ধে হার-জিত স্থির করতেই হবে।

উভয় পক্ষের গুলিগোলা সমানে চলল। ভোরের আলো দেখা দেবার আগেই লড়াই বন্ধ হয়েছিল কিন্তু জানা যায় নি হতাহতের সংখ্যা। কে জয়ী, কে বিজিত তাও জানা যায় নি। রাতের অন্ধকারে গুলি-গোলার শব্দে বন্য পাখীরা আশ্রয় ছেড়ে পালিয়েছিল, তারাই কিচির-মিচির করতে করতে গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াতে থাকে। শ্বাপদ যারা আশে-পাশে ছিল, তাদের কোন রকম অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না। বনের এধারে-ওধারে হয়ত দু'চারটে মৃতদেহ ছিল। যারা আহত, তারা বন অতিক্রম করার জন্য পথ খুঁজছিল। এর বেশি যে কিছু ঘটেছে তা কারও মনে করার কোন সুযোগই ছিল না।

কনসটান্সের ডান হাতে গুলি লেগেছিল।

অন্ধকারে দেখতে পেল না তার সঙ্গীদের। অনুভব করল সে একাই একটা বৃহৎ বৃক্ষের আড়ালে বসে আছে। হাতের বন্দুকটা পাশে পড়ে রয়েছে। আর বিলম্ব নয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে আহত স্থানকে বেঁধে হামাগুড়ি মেরে জঙ্গল পেরোতে থাকে। একমাত্র সঙ্গী বন্দুক ছিল তার বাঁ হাতে।

সারাদিন বনের মাঝ দিয়ে চলছে।

কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে পশুর পায়ের আঘাতে শুকনো গাছের পাতায় মচ্-মচ্ শব্দ হচ্ছে, কোথাও দিনের আলো ঢাকা পড়েছে গাছের ঝাপড়া পাতার আড়ালে। কনসটান্স পকেট থেকে শুক্‌নো পাঁউরুটি বের করে খেল। বোতলের জল ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কায় মাঝে মাঝে সামান্য জলে চুমুক দিয়ে পিপাসা মেটাচ্ছে।

সূর্য ডুবার আগেই বনের গভীরতা কমে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার গতিপথ পশ্চিম দিকে। বনের ঘনত্ব কমে যেতেই সে আশান্বিত হল। শীঘ্রই কোন লোকালয়ের সন্ধান নিশ্চয়ই পাবে।

সন্ধান সে পেয়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই দেখতে পেল দূরে একটা গ্রাম্য-গির্জার চূড়া। এবার সে আশ্রয় পাবে ঠিক-ই, শত্রু অথবা মিত্র সেটাই সমস্যা।

এগিয়ে চলছে কনসটান্স।

সাঁঝের প্রদীপ জ্বলেছে কারও কারও ঘরে। গির্জার ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও কনসটান্স এগিয়ে চলেছে। তার আশ্রয় চাই। অন্তত পিপাসার জল চাই! তার সঞ্চিত জল নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কালো মানুষের পল্লীর প্রথম বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কি করা যায়, এমন সময় নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কে ওখানে?

কনসটান্স কোন উত্তর দিতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা চর্বির বাতি হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি মহিলা। বয়স আন্দাজ করা সম্ভব হয় নি, তবে, পঁচিশ পেরোয় নি বলেই মনে হয়েছিল কনসটান্সের। কোন কথা না বলে পাথরের

মত্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বাঁ হাতে তার বন্দুক, ডান হাতের কনুইয়ের কাছে রুমাল বাঁধা। পরণে যোদ্ধার বেশ। তাকে দেখেই মেয়েটা চিৎকার করে উঠবার আশঙ্কায় কনসটান্স বলল, চুপ। আমি পিপাসার্ত, একটু জল দাও।

মেয়েটার মুখে-চোখে কেমন আতঙ্কের চিহ্ন। পরিধেয় নিম্নাঙ্গে, ঊর্ধাঙ্গ প্রায় উন্মুক্ত। মাথায় কোঁকড়া চুলের বব্। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে।

অপরিচিত জন, অথচ যেন পরিচিতের চাহনি। কিছু বলার আগেই কনসটান্স বলল, একটু জল।

এস, মৃদু আহ্বান মহিলার কণ্ঠে।

মহিলাটি তার ঘরের ঝাঁপ ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে পেছনে কনসটান্স এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

ভেতর থেকে আহ্বান এল, এস, ভেতরে এসে বস।

বিনা দ্বিধায় কনসটান্স গিয়ে বসল পাতার তৈরী মাদুরে। মহিলাটি এক বাটি জল এনে বলল, জল খাও। তুমি ক্লান্ত। উঃ, রক্ত কেন?

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছি।

কার সঙ্গে যুদ্ধ?

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে।

ওঃ। আর কোন কথা না বলে মহিলা শুকনো পাতা জ্বালল। জল গরম করে বলল, দেখি কোথায় তোমার আঘাত।

আঘাত গুরুতর নয়। রুমাল খুলে গরম জল দিয়ে আহত-স্থান ধুইয়ে দিয়ে কি যেন আনতে গেল মহিলাটি। কিছুক্ষণ বাদেই একটা মলম এনে প্রলেপ দিল আহত-স্থানে।

দু'দিনেই আরাম হয়ে যাবে।

কনসটান্স উঠে দাঁড়াল। বলল, আমার বোতলটা জল ভর্তি করে দাও। পথে পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারব।

তুমি কি এখনই যেতে চাও ?

হাঁ। এখানে হারমাদরা আমার খোঁজে আসতে পারে। তাতে তোমারও বিপদ ঘটবে। যদি জানতে পারে আমি তোমার আশ্রয়ে ছিলাম, তা হলে গোটা গ্রামটাই হয়ত জ্বালিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। তোমার কথা স্মরণ থাকবে।

তুমি যা বলেছ, তা সত্যি। কিন্তু তুমি তো আহত। এ অবস্থায় তোমার আহার্য ও বিশ্রাম প্রয়োজন। আজ রাতটা এখানেই থাক। কেউ জানতে পারবে না।

তোমার বাবা-মা আপত্তি করতে পারে।

তারা কেউ নেই। এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। আমার স্বামীকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল পর্তুগীজরা। তাকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল। সেখানে সে খতম হয়েছে।

মহিলাটি নির্বিকার ভাবে কথাগুলো বলে, আবার উনুনে আগুন দিয়ে রান্না চাড়িয়ে দিল।

কনসটান্স সব কিছু দেখছিল। কোন কথা বলছিল না। মহিলাটি ঘুরে আসতেই বলল, তোমার স্বামী কতদিন আগে যুদ্ধে গিয়েছে ?

সে অনেক দিন। আমার বিয়ের আট দিনের মাথায় তাকে টেনে নিয়ে গেছে। তাও তো ছয়টা বছর হয়ে গেছে। মরেওছে প্রায় সাড়ে-পাঁচ বছর। বিয়ের কথাও ভুলে গেছি, স্বামীর কথাও মনে নেই। আমার তো কেউ নেই, আছে স্বামীর কিছু জমি আর মেহনত করার মত দেহটা। কোন রকমে দিন চলে যায়।

তুমি আর বিয়ে কর নি ?

সময় পাই নি। চার্চের পুরোহিত তো এগিয়েই আছে। মতটা দিলেই হয়।

কনসটান্স কথার মোড় ফিরিয়ে বলল, আমাকে আশ্রয় দিলে তোমার অথবা এই গ্রামের কোন ক্ষতি হবে না তো ?

কেউ জানতেই পারবে না। তবে তোমার পোষাক বদল করে গ্রাম্য-পোষাক পরতে হবে।

কনসটান্স অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ। তোমরা কোন উপজাতীয়?

আমরা সাও। তুমি?

আমিও সাও। বোকোঙ্গো।

আমিও। ভালই হল। এবার পরিচয়ের অভাব হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে সুস্থ হওয়া অবধি এখানে থাকতে পাব।

সে রাতে কনসটান্স বন্য-পাতার চাটাইতে শুয়ে রাত কাটাল। মারিয়া দরজার ঝাঁপে পিঠ দিয়ে বসে রইল। মাঝে মাঝে উঠে এসে দেখছিল অতিথি ঘুমোচ্ছে কি না?

মাঝে মাঝে বন্য-জন্তুর চিৎকারে কনসটান্স জেগে উঠছিল। মারিয়া তাকে আশ্বাস দিয়ে আবার ঘুমোতে অনুরোধ করছিল।

সকাল বেলায় কনসটান্স গভীর ঘুমে, মারিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাহিরটা ভাল করে দেখে এল ফিরে এসে ডাকল, ওগো অতিথি, শুনছ।

চোখ কচলে কনসটান্স নির্লিপ্তভাবে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, কিছু বলছ কি?

বলছি। তুমি ঘর থেকে বেরিও না। আমি বাইরে যাচ্ছি খাবার সংগ্রহ করতে।

আচ্ছা।

গরম জল করে রেখেছি। হাত-মুখটা ধুয়ে নিও।

মারিয়া দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা দুয়েক পরে একটা ছোট ঝুড়িতে করে কিছু শাক-সব্জী আর ফল নিয়ে ফিরে এসে দেখল, তার অতিথি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

অতিথি সেবায় কোন ত্রুটি করেনি মারিয়া কিন্তু দু দিন যেতে না যেতেই কনসটান্স অস্থির হয়ে পড়ল। তার অনেক কাজ। সব কাজ পেছনে রেখে এভাবে আত্মগোপন করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তৃতীয় দিনে মারিয়া এসে বলল, হারমাদরা এই গ্রাম থেকে আট মাইল দূরে ক্যাম্প করেছে। ওরা বোধহয় এগিয়ে যাবে উত্তর দিকে।

কনসটান্স চিন্তিত হল।

কি ভাবছ?

ভাবছি আমিও বিপন্ন হব। যেমন-করেই হোক আমাকে মুক্ত এলাকায় যেতে হবে এবং যত শীঘ্র পারি ততই ভাল।

মারিয়াও এই কথা না ভেবেছে তা নয়। হয়ত হারমাদরা এই গ্রামেও হামলা করতে পারে। নিজের মনেই বলল, আশঙ্কা আছে।

তা হলে আমাকে বিদায় দিতে হবে। এখুনি আমি বনপথ ধরে অন্যত্র যেতে চাই।

তোমার কথা ঠিকই, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমাকেও তোমাদের মুক্ত এলাকায় নিয়ে চল।

সেখানে গিয়ে কি করবে?

তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের মত কাজ করব। চুপ। কেউ এদিকে আসছে। তুমি বেরিও না, আমি দেখে আসছি।

কনসটান্স অসময়ের একমাত্র বন্ধু বন্দুকটা টেনে নিল কাছে। শত্রুর মোকাবিলা করার প্রয়োজন থাকতে পারে। মারিয়া ঝাঁপ টেনে বেরিয়ে গেল।

বাইরে কতকগুলো লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, স্পষ্ট কিছু বুঝা গেলনা।

মারিয়ার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করতে থাকে কনসটান্স। স্নায়বিক কেমন একটা দুর্বলতা অনুভব করেছিল, অকারণে ঘেমে উঠতে থাকে।

বাইরে যারা কথা বলছিল তাদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছিল না। বোধহয় সবাই চলে গেছে। ঝাঁপটা সামান্য ফাঁক করে তাকিয়ে দেখল। কাউকে দেখতে পেলনা। ফিরে এসে আবার নিজের জায়গাতে বসল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল মারিয়া।

এত দেরী করলে কেন?

সব খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। পর্তুগীজ হারমাদরা গ্রামগুলো সার্চ করছে। কোথাও কোন বিদ্রোহী আছে কি না জানার চেষ্টা করছে। সন্দেহভাজন লোককে আটক করছে। যাদের আটক করছে তারা আর ঘরে ফিরছে না। সবাই মনে করছে, এই সব আটক কালো মানুষদের ওরা গুলি করে হত্যা করেছে।

বুঝলাম। এবার কি করতে চাও?

যা করব তাতো তোমাকে বলেছি। আজই, সম্ভব হলে এখুনি এই স্থান ত্যাগ করতে চাই।

তুমি কেন যাবে মারিয়া? আমার পথ তোমার পথ তো এক নয়। অনর্থক কেন বিপদের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নেবে। এই তো এখানে ভাল আছ।

তা তুমি বলতে পার। তবে আমি যখন স্থির করেছি এই স্থান ত্যাগ করব তখন আর দ্বিতীয় কোন যুক্তি শুনতে আমি রাজি নই।

তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বেশি বিপন্ন হব মনে করছি।

মোটেই বিপন্ন হবে না। কোথায় তুমি যেতে চাও?

ইউনিটার এলাকায়। বর্তমানে সিলভার পোর্টাতে যাব। সেখান থেকে নির্দেশ মত কাজে এগোব।

সিলভার পোর্টা কতদূর?

তা ছ-সাতশ' কিলোমিটার নিশ্চয়ই হবে।

সে তো অনেকদূর।

সেই জন্যই তো বলেছিলাম, তুমি এখানেই থাকো, আমার ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায় তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এই অনিশ্চিত জীবনের দিকে তুমি কেন পদক্ষেপ করবে!

জানিনা। আজই যেতে হবে।

আমি প্রস্তুত।

আমিও প্রস্তুত। সুযোগ বুঝে ঘর ছাড়তে হবে।

অবশেষে দু জনেই ঘর ছেড়েছিল।

দুজনেই চলছিল দক্ষিণ পূর্ব দিকে।

প্রথম কদিন কাটল গভীর জঙ্গলে। রাতের বেলায় মারিয়া ঘুমোত, কনসটান্স বন্দুক নিয়ে বসে বসে পাহারা দিত। কখনও কখনও গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু বড়ই সজাগ সে। কোন একটা শব্দ হলেই তার ঘুম ছুটে যেত। সতর্ক হয়ে যেত। সতর্ক হয়ে বন্দুক উঁচিয়ে বসত। যে দিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত।

সঙ্গের খাবার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

বনের শেষ নেই। বন্য ফল একমাত্র জীবন ধারণের উপাদান। মারিয়া শিম্পাঞ্জীর মত গাছে উঠত, ফল পাড়ত, সাজিয়ে দিত কনসটান্সকে, খেতে অনুরোধ করত। এমন নিপুণভাবে কনসটান্সের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখত যাতে কনসটান্স মোটেই মনে করতে পারছিল না সে গৃহ ছেড়ে বন্য জীবন যাপন করছে।

মারিয়া যেন পাগল করে তুলল কনসটান্সকে।

সারাদিন পথ চলার পর ক্লান্তিতে যখন ভেঙ্গে পড়ত কনসটান্স তখন শুকনো পাতার বিছানা পেতে কোলের ওপর কনসটান্সের মাথা নিয়ে মারিয়া চুপ করে বসে থাকত। কনটান্স হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বলত, তুমি শোবে না মারিয়া?

মারিয়া মৃদু হেসে বলত, তুমি ঘুমোও। আমি বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছি।

আমার চেয়ে তুমি তো বেশি ক্লান্ত। তুমিও শুয়ে পড়।

একজনকে জেগে থাকতে হবে।

রাতের বেলায়। এখন তো একটু ঘুমিয়ে নিতে পার।

জায়গা কোথায়?

কেন? আমার পাশে।

যত সহজে বলছ, অত সহজ তো কাজ নয়। তুমি পুরুষ আমি নারী। পাশাপাশি শোয়ার অনেক ঝামেলা। কথা শেষ করে মারিয়া মৃদু হাসল।

মারিয়ার মৃদু হাসি কনসটান্সের মাথায় আগুন জ্বেলে দিল।

এরপর আর মারিয়াকে কখন বলতে হয় নি শোবার স্থান করে নিতে। মারিয়া তার যথাযথ স্থানটিতে জায়গা করে নিয়েছে।

মারিয়ার হাত ধরে কনসটান্স এসে পৌছল সিলভার পোর্টে।

বিগত পনর দিন গোপন পথে কখনও হেঁটে, কখন গাড়িতে চেপে তারা গন্তব্যস্থল পৌছলেও তখনও তারা জানতে পারে নি পৃথিবীর কত ওলট পালট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

নিরাপদ আশ্রয়ে এসে প্রথম শুনল খাস পর্তুগালে বিপ্লব ঘটেছে। সালাজারী অপশাসন শেষ হয়েছে।

এমন সংবাদটি তাকে উৎফুল্ল করতে পারে নি। রাজা বদল হলেও রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বদল হবে এমন সম্ভাবনা কোথায়! সাম্রাজ্যবাদী সালাজারগোষ্ঠীর বদলে যারা গদীতে বসেছে তারা যে সালাজারগোষ্ঠীর চেয়েও কট্টর সাম্রাজ্যবাদী হবেনা এমন গ্যারান্টি কোথায়!

কনসটান্স পরপর কয়েক দিন সংবাদ সংগ্রহে বের হয়ে জানতে পারল, বর্তমান পর্তুগাল সরকার উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করতে প্রতিশ্রুত।

কনসটান্স হিসেব করে দেখল, স্বাধীনতা লাভ করবে মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ, কেপ ভার্দে, সানটোস এবং ত্রিনসিপি দ্বীপপুঞ্জ। অ্যাঙ্গোলাকে স্বাধীনতা দানেও পর্তুগীজ সরকার প্রতিশ্রুত। স্বাধানতা ঘোষণার দিনও স্থির। হিসাব মত সবার শেষে স্বাধীনতা লাভ করবে অ্যাঙ্গোলা। স্বাধীনতালাভের জন্য অ্যাঙ্গোলায় লড়াই শুরু হয়েছে ঠিকই, তবে পর্তুগীজ শাসন শেষ হলেই যে লড়াইয়ের সমাপ্তি হবে এমন কোন স্থিরতা নেই।

রাতের বেলায় মারিয়াকে সব ঘটনা শুনিয়ে কনসটান্স বলল, খাস পর্তুগালের শাসন ব্যবস্থা ওলট পালট হয়েছে, নতুন সরকার উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। নইলে পাঁচশত বৎসরের কায়েমী জমিদারী ছেড়ে যেতে চাইত কি? বিশ্ব-জনমতকে অগ্রাহ্য করে পর্তুগীজ হারমাদরা দম্ভের সঙ্গে সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণ করে এসেছে। তার পরিণতি এইভাবে হত কি?

মারিয়া কিছু বুঝল, কিছু বুঝলনা। বলল, আমি অত বুঝিনা। পর্তুগীজরা যে এদেশ ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছে এটাই হল সুখের কথা।

না সুখের কথা নয় মারিয়া। যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে মনে হয় অ্যাঙ্গোলার মানুষ ভ্রাতৃঘাতী লড়াইতে মেতে উঠবে। উত্তর থেকে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে রোবের্টো, দক্ষিণ থেকে এগিয়ে চলেছে জোসেফ সাভিম্বি, মধ্যপথে রয়েছে ডাক্তার নেটো। এরা সবাই চায় অ্যাঙ্গোলার ওপর প্রভুত্ব করতে। পর্তুগীজ সরকার কোন পক্ষকেই খুশী করতে পারবে না, যার পরিণতি হবে অসংখ্য ধন-প্রাণহানি। এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠছে।

আমরা কোন পক্ষ অবলম্বন করব?

সেটাই বড় প্রশ্ন। আমি এতদিন চেষ্টা করেছি তিনজনকে ঐক্যবদ্ধ করতে। আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কোন আশা নেই। কোন পক্ষ যে অবলম্বন করব তা এখনও স্থির করতে পারি নি।

কেন?

তিনটি পক্ষ তিনটি ভিন্ন আদর্শের সংঘাতে বৈরী ভাবাপন্ন। তার ওপর আছে তিনটি বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির কেরামতি। ঠিক এই ভাবেই বহু ধন-প্রাণ নষ্ট হয়েছে কোরিয়াতে, ভিয়েতনামে, এমন কি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ত্যাগ করার সময় ভারত বিভাগ ঘটিয়ে বহু ধন-প্রাণ হানি ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সর্বত্রই একরূপ। এবার অ্যাঙ্গোলাকে টুকরো টুকরো করে ক্ষমতা লিপ্সুরা আত্মতোষণ ঘটালে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বৃহৎ শক্তির নজরই বা কেন এদেশের ওপর? আমাদের দেশে আমাদের মনোমত সরকার আমরা পরিচালনা করব। অপর দেশ কেন এতে হস্তক্ষেপ করবে?

অনেক কারণ আছে। অ্যাঙ্গোলার এই যুদ্ধ সহজে থামবেনা মারিয়া। অ্যাঙ্গোলার সম্পদ লোভনীয়, অ্যাঙ্গোলার খনিজ তেল, হীরা, ইউরেনিয়াম সহ অন্যান্য খনিজদ্রব্য, তৎসহ রয়েছে দশটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর। এই বন্দরগুলো দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে সবচেয়ে বিশেষত্বপূর্ণ এবং পশ্চিমা শক্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাহায্যকারী। এগুলো হাতে রাখা খুবই প্রয়োজন। সেজন্য বৃহৎ শক্তিরা বেনামীতে এই ভ্রাতৃঘাতী লড়াইতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

কিন্তু এরা ঐক্যবদ্ধ কেন হয় না!

বললাম যে এদের পার্থক্য হল মূলত ব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখতে এরা আদর্শের বুলি শোনাচ্ছে। ওরা যে আদর্শের কথা সবাইকে শোনায় তার পেছনে রয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির গোপন ইচ্ছা। যে কোন প্রকারে সেই ইচ্ছা পূরণ করতে রক্তপাত ঘটাতেও দ্বিধা করবেনা।

মারিয়া অবাক হয়ে কনসটান্সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কনসটান্স বলতে বলতে থেমে গেল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই মারিয়া বলল, স্বাধীনতালাভ আমাদের কাছে ক্রমেই দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। এই ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

আগামীকাল Organisation of African Unity সঙ্ঘের বৈঠক বসছে। আফরিকার সব স্বাধীন দেশই পর্তুগীজ সরকারের প্রতিশ্রুতি শুনে আনন্দিত। কিন্তু তারাও গুরুতর ভাবে চিন্তিত। তারাও ভাবছে আফরিকার বুকে নতুন করে আবার অশান্তি দেখা দেবে। কঙ্গোর পরিণতি দেখে তারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, এই

বিশ্বাস সবার মনে। পাঁচশত বছর আগে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যারা এসে এদেশের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল প্রার্থীর মত তারাই যখন প্রভু হয়ে বসল তখনই দেখা গেল পশ্চিমী শ্বেতকায়দের স্বরূপ। সে সব ইতিহাস হল লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর শোষণের ইতিহাস। কালো মানুষ যে মানুষ একথাই তারা মনে করত না। যারা সভ্যতার দাবীদার তারা আফরিকার কালো মানুষকে সভ্যতার ছোঁয়া দিতে যত প্রকার হীন কার্য আছে অভিধানে তা করেছে বিনা দ্বিধায়। আজ তাদের দিন শেষ, আজ কালো মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। সেই মাথা যাতে অবনত বাখা যায় তার জন্য এই চক্রান্ত। মূর্খ কালো মানুষের দল ঐক্যবোধ হারিয়ে ওদের হাতের পুতুলে পরিণত হতে চলেছে।

কথা শেষ করে কনসটান্স মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

মারিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আলো নিভিয়ে শুয়ে পডতে পড়তে বলল, আমাদের কিছু করার আছে কি ?

ঠিক বলতে পারছি না। আমি তো আমাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। এখানে সাভিমবির আশ্রয়ে আছি। সাভিমবি দক্ষিণ আফরিকার সাহায্যে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলছে। তাদের উদ্দেশ্য পর্তুগীজরা দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশ দখল করা। আগে মনে করেছিলাম চীনের সাহায্য নিয়ে মোবুতু FNLA–কে সুসজ্জিত করবে। কি কারণে জানিনা চীন রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নিয়েছে। এবার তার স্থান নিয়েছে আমেরিকা। এবার তারা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলারের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে FNLA এবং UNITA-কে, অর্থাৎ এবার লড়াই করবে আমেরিকা আর রাশিয়া, অবশ্য বেনামীতে।

কে জিতবে বলতে পার ?

তাও অনিশ্চিত। আজ সবাই হিসাব করছে, যারা বেনামীতে লড়াইয়ের উসকানি দিচ্ছে তাদের সামর্থের উপর নির্ভর করছে

কোন পক্ষ জয়লাভ করবে। (More important will be the determination of the movements various backers that their side should win.) আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে মারিয়া।

কনসটান্স যখন বুঝতে পারল মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে-ও হাত-পা ছড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত তখনও ছিল অন্ধকারে। আশার আঁলো মিটি মিটি জ্বলছিল। যখন সত্যি সাত্য পর্তুগীজরা দেশ ছেড়ে যাবে তখনও অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে না। অতএব ভাবনা চিন্তার খোরাক যথেষ্ট থাকলেও করার কিছুই ছিলনা।

এতকাল পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তিনটি রাজনৈতিক সংস্থা যে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল সেই সংগ্রামেও মন্দা দেখা দিয়েছে। পর্তুগীজরা যখন দেশ ছাড়তে রাজি তখন তাদের রক্তপাত ঘটিয়ে লাভ কি। এ রক্তপাত না ঘটিয়ে তিনটি দলই তখন নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে। পর্তুগীজরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা দখল করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু এতক' ! যে গেরিলা যুদ্ধ চলেছে পর্তুগীজ শাসকদের বিরুদ্ধে তাতে সর্বাধিক অবদান রোবের্টোর। উত্তর অংশে তারই অনুগামীরা রক্তপাত ঘটিয়ে গ্রাম গঞ্জ দখল করে কালো মানুষদের কানে স্বাধীনতালাভের অমৃত বাণী শুনিয়েছে। রোবের্টোর বড় সমর্থক তার ভগ্নীপতি মোবুতু সর্বপ্রকারে সাহায্য দিয়েছে।

ষাট সালের প্রথম থেকেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূচনা।

এই ষাট সাল থেকেই অ্যামেরিকাও যথেষ্ট অর্থব্যয় করেছে তার অনুগত UNITA দলকে শক্তিশালী করতে। সিয়ার বড় বড় মাতব্বর ঘন ঘন আনাগোনা করছে দক্ষিণ অংশে। তারা প্রবেশ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে নামিবিয়ার গোপন পথে। অসংখ্য সিয়ার অনুচর এগিয়ে গেছে অ্যাঙ্গোলায়।

কিন্তু পর্তুগীজ উপনিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব পশ্চিমী শক্তিদেরও কম ছিল না। সেজন্য পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যখন লড়াই চলছিল তখন পশ্চিমীশক্তি বিশেষ কোন সাহায্য কোন পক্ষকেই করেনি। পর্তুগীজরা যখন অ্যাঙ্গোলা ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল তখনই আরম্ভ হল বিভিন্ন বৃহৎশক্তির খেলা।

পরদিন সকাল বেলায় কনসটান্স মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। মারিয়া তখনও ঘুমোচ্ছে। অতি সন্তর্পণে মারিয়ার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিয়ে কনসটান্স দরজায় তালা দিয়ে বের হল। তখনও সে মন স্থির করতে পারেনি কোথায় যাবে। শহরে যারা পরিচিত তাদের সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করাই ছিল উদ্দেশ্য।

এমন সময় একটা সাঁজোয়া গাড়ি এসে দাঁড়াল তার সামনে।

কনসটান্স পথ ছেড়ে একপাশে দাঁড়াল।

সাঁজোয়া গাড়ি থেকে নেমে এল একজন সৈনিক পুরুষ। এসে সেলাম করে বলল, আমার যদি ভুল না হয়, আপনিই সাও কনসটান্স।

মনে মনে ভীত হল কনসটান্স। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, কেন বলুন তো?

জেনারেল ডাক্তার জোসেফ সাভিমবি আপনাকে স্মরণ করেছেন।

তবুও জিজ্ঞাস করল, আপনি কি আমার পরিচিত কেউ?

সৈনিক পুরুষ বলল, আমি আপনার পরিচিত নই। তবে ইতিপূর্বে আপনি যখন জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তখন কয়েকবার আপনাকে দেখেছি।

ওঃ! আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু। বেশ, আপনার জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি। তবে আজ নয়, কদিন পর আমি যাব। উনি কোথায় আছেন?

উনি আছেন নোভা লিসবনে। আজই আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। গত সাতদিন যাবত আপনাকে গোটা দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলায়

খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। আপনার পৌঁছা সংবাদ জানি, বাসস্থান জানতাম না, ভাগ্যক্রমে কালরাতে আপনার সংবাদ পেয়েছি। আপনার বাসস্থানেই যাচ্ছিলাম। ভালই হল, পথে দেখা হয়ে গেছে। আসুন।

কিন্তু আমার অসুবিধা আছে।

অসুবিধা সবারই থাকে। এখন জরুরী অবস্থা। সব অসুবিধা ভুলে কর্তব্য কাজ করতে হবে, এটাই আমরা বুঝি।

আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিতে হবে। তাকে কোন খবর না দিয়ে তো যেতে পারি না।

আমরা খবর দিচ্ছি।

কনসটান্স বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনারা জুলুমবাজী করতে চান।

আমি খুবই দুঃখিত। জুলুম করার কোন নির্দেশ আমাদের নেই। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। বিষয়টি খুবই গুরুতর ও জরুরী। ইতিমধ্যে সাতটা দিন কেটে গেছে।

আর দু এক ঘণ্টা দেরী হলে বাইবেল অশুদ্ধ হবে না। আমার স্ত্রী এখানে একা আছেন। তার পরিচিত জনও কেউ নেই এই শহরে। তার ব্যবস্থা না করে এখান থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কোথাও যাওয়া উচিত মনে করি না। হয়ত আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

সৈনিক পুরুষ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, বেশ। চলুন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু ব্যবস্থা করে নিন। তবে দেরী করলে আমরা বিপদগ্রস্থ হব। সে জন্য বিশেষ অনুরোধ, কোন প্রকারে যেন আমরা বিপন্ন না হই, সেটা লক্ষ্য রাখবেন।

গাড়ি এসে দাঁড়াল কনসটান্সের বাসার সামনে।

কনসটান্স দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে দরজার তালা খুলল। মারিয়া তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ব্যস্ততার সঙ্গে তাকে প্রবেশ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে কনসটান্স?

কনসটান্স সংক্ষেপে ঘটনাটা বলতেই মারিয়া বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জানতো বর্তমানে চলাচল বড়ই বিপদজনক।

সেইজন্যই তোমার সঙ্গ ছাড়ি নাই। মা মেরীর দিব্যি আমাকে একা এখানে রেখে যেও না।

তা হলে প্রস্তুত হয়ে নাও। সাভিমবির পেয়াদা সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে পথ পাহারা দিচ্ছে। বিলম্ব করা চলবে না।

তাড়াতাড়িতে দুজন প্রস্তুত হয়ে নিল। তারা গাড়িতে উঠামাত্র গাড়ি ছুটল তীব্র বেগে।

মারিয়া ডাকল, কনসটান্স।

কনসটান্স পাশেই বসেছিল অন্যমনস্কভাবে। মারিয়ার ডাকে কনসটান্স সম্বিত ফিরে পেল। মুখ ফিরিয়ে কনসটান্স শুধুমাত্র উদাসভাবে তার দিকে তাকাল।

ডাক্তার সাভিমবির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।

হাঁ।

তার অতীত সম্বন্ধে কিছু জান কি ?

সামান্য কিছু শুনেছি। গতবার যখন রোবের্টোর প্রস্তাব নিয়ে নোভা লিসবন (Nova Lisbon) গিয়েছিলাম তখন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম।

মারিয়া উদগ্রীব ভাবে কনসটান্সের মুখের দিকে চেয়ে রইল আর কনসটান্স বলতে থাকে সাবিমভির কথা।

একটা উচ্চাভিলাসী যুবক। যেমন কুৎসিত তার চেহারা তেমনি কুৎসিত তার সাজসজ্জা। বিশাল যেমন তার বপু তেমনি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দাড়ি।

ধনীর সন্তান। ধনের প্রাচুর্য তাকে কালো অভিজাত সমাজে স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। বিশেষত নেটোর মত সেও একজন ডাক্তার। সমাজসেবার নামে নিজের স্থান গড়তেও কষ্ট হয় নি।

ব্যর্থ প্রেমিক সাভিমবি শ্বেতাকায়া নারীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে সারা জীবন ধরে। ব্যর্থতার বেদনা তাকে বর্ণবিদ্বেষী করেছে ঠিকই কিন্তু শ্বেতকায়াদের বৈভব তাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল প্রথম জীবন থেকে।

ইউরোপীয় দেশগুলো পরিভ্রমন করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বর্ণবিদ্বেষের। বিশেষ করে লিসবনে আর প্যারিসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল পদাহত সারমেয়ের মত মর্যাদালাভ করে। সাভিমবি ফিরে এল দেশে, মনে নিয়ে এল পর্তুগীজ বিদ্বেষ। সাভিমবি বুঝে এসেছিল, কালো রং-এর চেয়ে বড় কলঙ্ক হল পরাধীনতা। স্বাধীনতা লাভ না করলে সমমর্যাদার দাবী কোন কালেই রক্ষিত হবে না।

স্বাধীনতা লাভের জন্য লড়াই করতে হবে। লড়াই করতে হলে প্রয়োজন জন সমর্থন।

জন সমর্থনলাভের আশায় সাভিমবি তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল শিক্ষিত সমাজে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু মানুষ তার চারপাশে সমবেত হল ঠিকই কিন্তু তার দলকে কার্যোপযোগী করতে প্রয়োজন অর্থের। অর্থসংস্থান করার পথ তো খুব সহজ নয়।

উপদেষ্টার দল বলল, অর্থের জন্য কোথাও যেতে হবে না। যে শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম সেই শ্বেতকায়দের পরাভূত করতে হলে সাহায্যকারী হবে অপর কোন শ্বেতকায়দের দল। তারাও চায় পর্তুগীজ শাসনের অবসান। তার জন্য অর্থ সাহায্য করবে ঠিকই তবে বিনিময়ে তাদের দিতে হবে স্বাধীন অ্যাঙ্গোলায় বিনা বাধায় বাণিজ্য করার সুযোগ।

সাভিমবি বলল, এতো মোটেই কষ্টকর বিষয় নয়। বাণিজ্য করার সুযোগ দিতে আমার আপত্তি নেই। আমাদের নিজস্ব পুঁজি নেই অথচ দেশকে উন্নত করতে হলে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটাতেই হবে। 'এর জন্য বিদেশী পুঁজিকে আহ্বান জানাতেই হবে।

আমরা তাতে খুশী হব। আমাদের আর কাউকে ডাকতে যেতে হবে না।

সাভিমবি টোপ গিলল।

সাহায্য করতে এগিয়ে এল সিয়ার গোপন দপ্তর। অঢেল টাকা আসতে থাকে মার্কিন দেশ থেকে। সাভিমবি অর্থের জোয়ারে নিজ-সত্তা রাখতে পারছিল না। এমন সময় আমি গিয়েছিলাম ঐক্যের প্রস্তাব নিয়ে।

সাভিমবি তখন স্বনিযুক্ত জেনারেল। অঢেল টাকা। প্রাসাদে বাস করে। কয়েক হাজার তার দেহরক্ষী আর মার্কিন অস্ত্রের ছড়াছড়ি।

বললাম, জেনারেল সাহেব, দেশ বিভাগের চিন্তা অথবা ক্ষমতা লাভের চিন্তা ত্যাগ করে সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা। যদি আমরা স্বাধীনতালাভ করতে পারি নিজেদের চেষ্টায় তাহলে ঘরোয়া বিবাদ আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারব। অবশ্য যদি বাহির থেকে কোন উস্কানি আসে তা হলে সে সমস্যা মেটা কঠিন। বর্তমানে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

সাভিমবি আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। যখন সে ক্ষমতা-লাভের আকাঙ্খায় পাগল সেই সময় কঙ্গো আর জাইরের আভ্যন্তরীণ অশান্তির সুযোগে ডাক্তার নেটো ঘর গোছাতে ব্যস্ত। অস্থিরমতি মোবুতু তখন তার শ্যালককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখছে। সুযোগ-সন্ধানী ডাক্তার নেটো তখন ছুটেছে মস্কোতে, গড়ে তুলছে তার বাহিনী। আর এই দুই নেতা তখন স্বপ্ন দেখছে। অবশ্য রোবের্টোর ইচ্ছা ছিল সাভিমবির সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার। সাবিমভি অ্যাঙ্গোলা ভাগ করতে রাজি তবুও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে রাজি নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘরোয়া বিবাদ কিভাবে জাতির ভাগ্যে দুর্দিন ডেকে আনে তার নজীর আছে ভূরিভূরি। ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না কেউ-ই।

এবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে নতুন কোন প্রস্তাব নিয়ে দৌত্য কার্য করতে।

সবার একজন হতে না পারলে কখনই ক্ষমতায় বহাল থাকা যায় না এই জ্ঞানটাও এদের দুজনের নেই। নানা চক্রান্তের নায়ক মোবুতুর পরামর্শ নিয়ে চলেছে রোবের্টো। রাষ্ট্রপতির শ্যালক, আরেকটি রাষ্ট্রের প্রধান হবার স্বপ্ন দেখছে। আভিজাত্যবোধ প্রবল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলাই তার অভ্যাস। এই উন্নাসিকতা তাকে দশজনের একজন করতে পারে নি। অথচ সাভিমবি প্রথম জীবনে নানা দুর্যোগের মাঝদিয়ে চলেছে। অনেক ঝড়-ঝাপটা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। স্বভাবতই নিজেকে দশজনের একজন মনে করা উচিত ছিল। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃখের অংশীদার হওয়া উচিত। তা না হয়ে বিদেশীর অর্থে শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ বজায় রাখতে অসাধারণ মানুষের একজন হতে হয়েছে তাকে। যার ফলে সাভিমবিও দশজনের একজন হতে পারে নি। সাধারণ মানুষের কাছে সে যেন দেবতার মর্যাদা আদায়কারী।

সাভিমবি নিজেই বলেছে প্যারিসে সে কয়েকদিন কাটিয়েছে। তার বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা বড়ই মর্মান্তিক। অপরাধ সে করেছিল, ফরাসী আইনে কিন্তু শাস্তি ছিল বড়ই কঠোর।

বন্দী জীবনই তাকে শ্বেতকায় বিদ্বেষী করেছিল। সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যদি তাকে সামাজিক ঘৃণায় পরিণত করতে পারত 'তা হলে আজ সাভিমবি কোন মতেই পশ্চিমী শক্তির দয়ার উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তথাকথিত জাতীয়তাবাদ আর মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন দেখত না। তার নীতিহীনতাই ও. পতন ঘটাবে।

নোভা লিসবন দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার সর্ব বৃহৎ শহর। সাভিমবির প্রধান কর্মকেন্দ্র।

সাঁজোয়া গাড়ি নোভা লিসবনে প্রবেশ করল তখন অনেক রাত।

পথঘাট জনশূন্য। গাড়ির তীব্র আলোতে ভাঙ্গাচোরা পথগুলো অদ্ভুত সৌন্দর্য সৃষ্টি করছিল। গাড়ির ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির হেডলাইট যেন উদ্দাম তালে নৃত্য করতে থাকে। মারিয়া অপলকে দেখছিল। গাড়ির শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তিন অথবা চারটি পথের সংযোগস্থলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল হালকা ট্যাংক। ট্যাংকের সৈনিকরাও বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল। সাঁজোয়া গাড়ির শব্দে কোথাও কোন জীবন্ত মানুষের ব্যস্ততা দেখা গেল না। পাথরের মত নিশ্চুপ ও নিথর সবাই। দু পাশের বাড়িগুলোর দরজা জানলা বন্ধ। কোন গৃহ থেকে সামান্য আলোর ছটাও দেখা যাচ্ছে না। একটা মৃত নগরীর মত অতীতের সাক্ষ্য বহন করতে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

সাঁজোয়া গাড়ি এসে দাঁড়াল সাভিমবির প্রাসাদের সামনে। সতর্ক প্রাসাদরক্ষীর ঘিরে ফেলল সাঁজোয়া গাড়িকে। গাড়ি থেকে সৈনিক পুরুষটি নেমে দাঁড়াতে সভয়ে সবাই সেলাম দিল।

প্রেসিডেন্ট ঘুমিয়েছেন কি ?

ঠিক বলতে পারিনা স্যার। টেলিফোনে খবর করে নিচ্ছি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সেনট্রির নেতা বলল, রাত একটায় প্রেসিডেন্ট ঘুমোতে যান। এখনও ঘুমোননি। রাত বারোটা মাত্র বেজেছে। তবুও খবর নিচ্ছি।

টেলিফোনে খবর পৌঁছাল প্রেসিডেন্টের খাস কামরায়। সম্মতি এল তক্ষুণি।

কনসটান্স মারিয়ায় হাত ধরে পরিচালকের পেছন পেছন প্রাসাদে প্রবেশ করল।

খাস কামরায় সাভিমবি পায়চারি করছিল।

দরজায় ধাক্কা পড়তেই সাভিমবি আহ্বান জানাল, ভেতরে আসুন।

কনসটান্স মারিয়ার হাত ধরে প্রবেশ করা মাত্র সাভিমবি বলল, আমি আপনার জন্য কয়েকদিন যাবত অপেক্ষা করছি।

আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কি এত জরুরী কাজ যার জন্য বলতে গেলে বন্দীর মত আসতে বাধ্য হলাম।

বন্দী। না, না। তাতো হতে পারে না। বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আপনাকে আনতে বলেছি। আমি সংবাদ পেয়েছিলাম আপনি বোমা শহরের ছাউনী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। আপনি যে চিরকাল আত্মগোপন করে থাকবেন এটা আমি বিশ্বাস করি নি। আরও খবর পেয়েছিলাম আপনি আমার এলাকায় এসেছেন, কিন্তু কোথায় বাস করছেন এটা জানা ছিল না। আমার দলের সবাইকে বলেছি আপনাকে খুঁজে বের করতে।

তিনজন পাশাপাশি বসতেই বেয়ারা এসে উষ্ণ পানীয় পরিবেশন করল।

কোকো খেতে খেতে সাভিমবি বলল, আপনি তো জানেন পর্তুগীজরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তারিখ ঠিক করেছে দশই নভেম্বর মধ্যরাত্রি।

জানি।

আমি প্রত্যক্ষ করছি অ্যাঙ্গোলা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন। পর্তুগীজ সৈন্য এদেশ থেকে চলে যাবার পর কি হবে সেইটেই ভাবছি।

কনসটান্স বলল, স্বাধীন দেশের ভাগ্য দেশের মানুষই নির্ধারিত করবে।

আপনার কথাটা শুনতে ভাল কিন্তু কাজটা করা খুবই কঠিন, বলতে গেলে অসম্ভব। অ্যাঙ্গোলার কালো মানুষের শতকরা মাত্র দুইজন লেখাপড়া জানে। তাদের পক্ষে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবার যোগ্যতা আছে কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অশিক্ষিত জনতার জন্য আমার মত শক্ত পরিচালক প্রয়োজন। শক্ত হাতে হাল ধরলে তবে এদের উন্নতি সম্ভব তবেই সু-শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী হবে।

কনসটান্স মৃদুকণ্ঠে বলল, জেনারেল কি বিশ্বাস করেন বন্দুক-

কামান দিয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্ভব? তা যদি হোত তা হলে পর্তুগীজরা কেন তা পারল না, কেনই বা তারা অ্যাঙ্গোলা ছেড়ে যেতে চায়?

তারা বিদেশী। এদেশের একজন লোকও তাদের পছন্দ করে না।

কিন্তু পর্তুগীজদের অনুগৃহীত ব্যক্তির অভাব কি আছে অ্যাঙ্গোলায়? আফরিকার কালো মানুষদের অনেকেই তো তাদের কৃপা লাভ করে শিক্ষাদীক্ষায় এবং অর্থসামর্থ্যে অনেক এগিয়ে গেছে। তারাই তো পর্তুগীজ শাসনের স্তম্ভ। তাদেরই তো শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে অপরোক্ষে পর্তুগীজ প্রশাসন আজও চলছে। যে কোয়ালিশন প্রশাসন চলছে তাতে ক'জন পর্তুগীজ আছে? প্রায় সবাইতো কালোমানুষ, কিছু আছে সঙ্কর পর্তুগীজ। তবুও কেন প্রশাসন সচল? আজও কেন পর্তুগীজরা আমাদের প্রভু?

সাভিমবি পায়চারি করতে করতে বলল, আপনার যুক্তি অস্বীকার করতে পারছি না। তবে আমি মনে করছি, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেবার অর্থ অন্য প্রকার। সবাই তো আমাদের সঙ্গে হাতেহাত মিলিয়ে বিপ্লবে যোগ দেয় নি। যারা দিয়েছে আমি তাদেরই প্রতিনিধি।

কিন্তু আপনি তো একা নন জেনারেল সাহেব। রোবের্টো একই দাবী জানাচ্ছে। সেও বলছে জনতার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার একমাত্র তারই আছে। ডাক্তার নেটোর অভিমতও তাই। এমত অবস্থায় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বই স্বাভাবিক।

আপনাকে সে-ই কথা বলতেই ডেকেছি। আপনি তো জানেন ডাক্তার নেটো এদেশে কম্যুনিজমের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। তাকে যে কোন প্রকারে প্রতিরোধ করতেই হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ। ডাক্তার নেটো মধ্যপ্রদেশে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। পর্তুগীজরা দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিক থেকে রোবের্টো আর দক্ষিণ দিক থেকে আমি আক্রমণ করে ডাক্তার নেটোর কর্তৃত্ব চিরকালের জন্য বন্ধ করতে চাই।

কনসটান্স বলল, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নেই। তবে যতটা সহজ মনে করছেন অতটা সহজ বলে মনে হচ্ছে না।

আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে সিয়া।

কিন্তু রোবের্টো কি সহজে আপনাকে গ্রহণ করবেন। আপনি ও রোবের্টো ছেষট্টি সাল অবধি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। সামান্য কারণে তার সঙ্গ ছেড়ে নতুন দল গঠন করেছেন। উপরন্তু গত তিন বছর যাবত আমি আপনার দরজায় বার বার এসেছি ঐক্য গড়ে তুলতে। তাও তো আপনি রাজি হন নি।

আজ জাতির জীবনে সবচেযে কঠিন সময় উপস্থিত। এখন ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। আপনি যে কোন উপায়ে সম্মত করুন রোবেটোকে। যে সময়ে তাকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম সে সময় রোবের্টো কম্যুনিষ্ট চীনের দিকে ঝুঁকেছিল। আজ চীন আর নেই, এবার আমাদের রাজত্ব। নিশ্চয়ই রোবের্টো রাজী হবে। আপনি আমার প্রস্তাব তাকে জানাতে ভুল করবেন না।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে দ্বিতীয় ভিয়েতনামের পটভূমিকা এই ভাবেই তৈরী হবে পরবর্তী কালে। ভিয়েতনামের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আঙ্গিনায় পরিণত হবে অ্যাঙ্গোলা।

আমি চাই না এরকম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হই। তবু কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য যাতে বিস্তার লাভ না করে তার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই। এই কাজে সর্বাধিক সাহায্য করতে পারে রোবের্টো। আমি চাই আপনি যত শীঘ্র পারেন রোবের্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার কথা তাকে বলবেন এবং আমার ইচ্ছা জানাবেন। আমি চাই আমরা দুজন দুদিক থেকে আক্রমণ করে অ্যাঙ্গোলা থেকে ডাক্তার নেটো তথা কম্যুনিষ্টদের তথা রাশিয়াকে বিতাড়িত করতে।

আপনার মতামত তাকে জানাব নিশ্চয়ই। তবে এতেও আমি আশ্বস্ত হতে পারছি না। UNITA এবং FNLA. যদি সমবেত ভাবে MPLA-কে পরাজিত করতেও পারে তাতে যে অ্যাঙ্গোলার

সমস্যা সমাধান হবে এটা মনে করা ভুল হবে জেনারেল। পরবর্তী কালে UNITA এবং FNLA আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামবে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করতে এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে। তখনই গুরুতর বিপদ দেখা দেবে। (There is a real danger that if they jointly succeeded in defeating the MPLA they would then start fighting between themselves). ক্ষমতার লোভকে তখন কোন পক্ষই সংযত করতে পারবে না।

জেনারেল সাভিমবি কনসটান্সের যুক্তি অস্বীকার করতে পারল না। নেতিবাচকভাবে বলল, আমাদের উভয়ের শত্রু MPLA.; এই সাধারণ শত্রুকে নির্মূল করতে পারলে তখন নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করতে পারব।

আফরিকান সংহতি পরিষদ (Organisation of African Unity) যে ঐক্যের ফরমূলা এনেছে সেটা একটু ভেবে দেখুন।

রাবিশ। ইদি আমিন নিজেই একজন বিশ্বাসঘাতক, তাকে বিশ্বাস করে কোন কাজ করলে, আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তেমন কাজ আমি করতে পারি না।

কিন্তু আমার মনে হয় অ্যাঙ্গোলায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে বৃহৎ-শক্তির মধ্যেই। এই সব বৃহৎশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মাঝারি ধরণের শক্তিরাও। তারাও বিভিন্ন শিবিরে মদৎ জোগাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার পথ খোঁজাই বড় কাজ মনে হয়।

আগে স্বাধীনতা, আগে দেশের মুক্তি। স্বাধীনতালাভের জন্য আমরা বিভিন্ন শক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি ঠিকই, তার অর্থ এটা নয় আমরা তাদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছি।

কনসটান্স খুশী হল না জেনারেল সাভিমবির যুক্তিতে। তার কামনা, ঐক্য ঘটুক সর্বাঙ্গীণ। OAU (Organisation of African Unity) যে ফরমূলা দিয়েছে সেই ফরমূলার সামান্য রদবদল করে অ্যাঙ্গোলার তিনটি দল ঐক্যবদ্ধ হলেই তবে অ্যাঙ্গোলার

প্রকৃত মুক্তি আসা সম্ভব নইলে গৃহযুদ্ধে অ্যাঙ্গোলা ক্ষত বিক্ষত হবে। রোবের্টোর কাছে যেতে তার আপত্তি ছিল না। মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনার অভিপ্রায় অনুসারে আমি আগামী কালই বোমা (Boma) শহরে যাচ্ছি ফলাফল কি হবে তা জানি না।

শুভরাত্রি জানিয়ে কনসটান্স মারিয়ার হাত ধরে বাইরে আসতেই একজন সৈনিক পুরুষ পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে গেল নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায়।

সৈনিক পুরুষ জিজ্ঞাসা করল, কোন আদেশ আছে?

আমার নিজস্ব কোন আদেশ নেই। জেনারেল আমার বিষয়ে আদেশ দেবেন।

রাত তখন তিনটে।

সৈনিক পুরুষকে বিদায় দিয়ে কনসটান্স বিছানায় গা এলিয়ে দিল। মারিয়া চুপ করে বসে রইল তার মাথার কাছে।

কি ভাবছ মারিয়া?

ভাবছি মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি কি হতে পারে।

ওসব চিন্তা করে লাভ নেই মারিয়া। আমাদের ভাসতে হবে স্রোতের সঙ্গে. এখন ঘুমোও। আবার কালকেই বের হতে হবে অনির্দিষ্ট যাত্রা পথে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

চার

> The ideological and personal difference between the movements' leaders are now too deep and vested interest of their various backers are too great to allow a peaceful settlement now.

চুয়াত্তর সালের এপ্রিল। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের অধিবাসীরা কামানের আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠেছে। বেতার ঘোষণা শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিল না দেশের মানুষ। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি সালাজারের রাজত্বের অবসান ঘটতে পারে কখনও।

সামরিক বাহিনী বিদ্রোহ করেছে। ক্ষমতা দখল করেছে। যুগ যুগান্তের পাপ শাসনের অবসান ঘটতেই চোখ মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখল দেশের লোক। শুধুমাত্র ডিকটেটরী শাসনের অবসান ঘটে নি, বামপন্থী নয়া সরকার ঘোষণা করেছে, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব তারা পরিত্যাগ করেছে। পর্তুগীজ সাম্রাজ্য যেখানে যা আছে তার অধিবাসীরা পাবে স্বাধীনতা। এই সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে।

সংবাদটি যখন প্রচারিত হল তখন ডাক্তার নেটো ছিল রাশিয়াতে।

সুযোগ সামনে। সুযোগ-সন্ধানী ডাক্তার নেটো এত বেশি আশা করে নি। তখনই আরম্ভ হল ক্ষমতা লাভের শলাপরামর্শ।

আমরা চাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক অ্যাঙ্গোলায়।

তার প্রতিবন্ধক FNLA এবং UNITA, তারা চুয়াত্তর সাল

থেকেই লড়াই করছে অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা আদায় করতে। ষাট সাল থেকে রোবের্টো মোবুতুর সাহায্যে তার সংগ্রামী অনুগামীদের গড়ে তুলছিল।

ডাক্তার নেটো মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম হোতা। তার অনুগামীদের তখন তৈরী করা হচ্ছে কঙ্গোতে। এদের অস্ত্র সজ্জিত করা এবং সমর শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল রাশিয়া। সেই কাজ সম্পন্ন করতে খুব বেশি বিলম্ব ঘটে নি।

পঁচাত্তর সালের আগষ্ট।

সবার সামনে একটিমাত্র তারিখ।

দশই নভেম্বর সেই তারিখটি।

পর্তুগীজ সরকার তখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। আগষ্ট মাসেই তিনটি ক্ষমতালিপসু দল রাজধানী লুয়ান্দায় প্রাধান্য বিস্তার করতে ব্যস্ত। পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি কোন মতেই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নয়। তারা দর্শকমাত্র। তারাও স্থির করেছে যারা লুয়ান্দায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে তাদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিয়ে যাবে।

এই সংবাদটি প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোবের্টো তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হল রাজধানী দখল করতে।

এমন সময় কনসটান্স হাজির হল তার কাছে। সাভিমবির প্রস্তাব উত্থাপন করল কনসটান্স। অভিনিবেশ সহকারে কনসটান্সের বক্তব্য শুনে রোবের্টো তার মতামত পরে জানাতে চাইল।

কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আজ বিলম্ব করার সময় নেই।

জানি। আমারও বিলম্ব করার সময় নেই বন্ধু। আমার বাহিনা এগিয়ে চলেছে রাজধানী লুয়ান্দার দিকে। যে কোন মূল্যে আমি লুয়ান্দা দখল করতে চাই।

এই কাজে সাভিমবি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। সেও এগিয়ে আসছে লুয়ান্দার দিকে।

যে প্রথম দখল করতে পারবে তারই হাতে থাকবে অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত। আমি সর্বাগ্রে দখল করতে চাই। সাভিমবির বাহিনী পৌঁছবার আগেই আমি পৌঁছাব। যদি বিলম্ব করি তা হলে MPLA এগিয়ে আসবে। একবার তারা যদি লুয়ান্দায় পৌঁছে যায় তখন তাদের হটিয়ে দেওয়া কঠিন হবে। আমার কাছে সংবাদ এসেছে ডাক্তার নেটো কঙ্গো থেকে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে লুয়ান্দার দিকে এগোচ্ছে। আমার বাহিনী লুয়ান্দার উপকণ্ঠে পৌঁছেছে। এ সময় আমি অন্য কোন চিন্তা করতে পারছি না বন্ধু। দ্বিতীয়ত আমি লুয়ান্দা পৌঁছে পর্তুগীজদের কাছ থেকে যদি ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারি তা হলে সাভিমবির কোন সাহায্য প্রয়োজন হবে না। তখন আমরা বসে আলোচনা করতে পারব।

রোবের্টোর মনোভাব স্পষ্ট। কোন মতেই রোবের্টো সাভিমবিকে ক্ষমতার অংশীদার করতে রাজি নয়।

কনসটান্স আর কোনভাবেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে চায় নি।

সত্যি সত্যিই আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বিনা বাধায় রোবের্টোর বাহিনী লুয়ান্দার উপকণ্ঠে প্রবেশ করল। ক্ষমতালাভের আশায় পর্তুগীজ হাই-কমিশনার অ্যাডমিরাল লিওনেল কার্ডোসোর সঙ্গে দেখা করে কথা পাকাপাকি করে নিতে চায়।

কার্ডোসোর রোবের্টোর প্রস্তাব অস্বীকার করে নি। সেও চায় বিনা বাধায় এবং কোনরূপ অশান্তি না করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে।

কার্ডোসোর বলল, তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি রোবের্টো। কিন্তু নভেম্বরের দশ তারিখের আগে তো কিছু করতে পারি না। নিয়মমত হস্তান্তর হবে সেই তারিখে। ইতিমধ্যে তুমি শাসন ব্যবস্থায় তোমার লোকজনকে বসিয়ে দাও, অসামরিক প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব তুমি নিতে পার। কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা দেখিও না, তাতে নীতিগত ভাবে আমরা বাধা দেব।

রোবের্টো খুশী হল কার্ডোসোর কথায়। সেও প্রস্তুতি নিতে থাকে অসামরিক প্রশাসনে নিজের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে।

বাধা পেল সাভিমবির কাছ থেকে। কার্ডোসোর কাছে সাভিমবির দূত এসে বলল, মাননীয় হাই কমিশনার বাহাদুর, আমাদের জেনারেল সাভিমবি সংবাদ পাঠিয়েছেন, এক তরফা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জটিলতা দেখা দেবে। রোবের্টোর হাতে সম্পূর্ণ-ভাবে অসামরিক শাসন ক্ষমতা তুলে দিলে পরিণতিতে রক্তপাত ঘটতে পারে। জেনারেল বলেছেন, যদি আপনি এই অনুরোধ না রক্ষা করেন তা হলে অচিরেই জেনারেল সসৈন্যে হাজির হবেন এবং শক্তি প্রয়োগ করে অপর যে কোন শক্তিকে হটিয়ে দেবেন। আপনারা অ্যাঙ্গোলা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কারও হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেবেন না।

কার্ডোসোর বলল, এ বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার প্রয়োজন। তোমাদের জেনারেলকে এখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাও। সে না আসা অবধি স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে।

রোবের্টোর প্রথম কূটনৈতিক পরাজয় ঘটল।

সাভিমবির জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হল।

দিন কাটছে।

নোভা লিসবন থেকে আকাশ পথে কয়েক ঘণ্টার পথ হলেও যথাস্থানে সংবাদ পৌছতে এবং নিরাপদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে দুটি দিন কেটে গেল। সংবাদ পাওয়া গেল, সাভিমবি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লুয়ান্দা পৌছবে।

চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ হবার অনেক আগে লুয়ান্দার উপকণ্ঠে কামান গর্জে উঠল। ডাক্তার নেটোর বাহিনী রোবের্টোর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লুয়ান্দার দখল নেওয়া হল সব চেয়ে বড় কাজ। যার হাতে থাকবে লুয়ান্দা, ভবিষ্যতে তার হাতেই পর্তুগীজরা তুলে দিয়ে যাবে অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত।

সংবাদ যথা সময় সাভিমবিও পেয়েছে। তার বাহিনীও দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে লুয়ান্দার উপকণ্ঠে এসে গেছে। তারাও লুয়ান্দার দখল নিতে আগ্রহী।

কার্ডোসো দর্শক মাত্র।

সব সংবাদ তার কাছে পৌঁছচ্ছে কিন্তু গৃহ যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ নেই। কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করবে পর্তুগীজ সৈন্য। লুয়ান্দা যারা দখল করবে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের হাতেই দিয়ে যাবে অ্যাঙ্গোলার শাসন ব্যবস্থা।

তবুও তার শেষ চেষ্টা হল তিনটি বিবদমান দলকে শান্ত করে একটা সর্বজন গ্রাহ্য প্রস্তাবে সবাইকে রাজি করা।

কার্ডোসো শান্তি চায়। পররাজ্যলোলুপ পর্তুগীজরা বুঝেছে পশুশক্তি দিয়ে দেশ দখলে রাখা যায় না। শান্তির মাধ্যমে সমস্যা মেটানোই হল সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

তিন পক্ষের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসল কার্ডোসো।

এদিকে যুদ্ধ চললো।

তিন পক্ষই বিভিন্ন শক্তির সাহায্য পুষ্ট। সবাই মনে করছে, আমি কিসে ছোট! বিচার হবে লড়াইয়ের ময়দানে। অ্যাঙ্গোলার ভাগ্য স্থির করব বন্দুকের মুখে।

অতএব লড়াই ছড়িয়ে পড়ল বন্দর এলাকায়।

বন্দরের লড়াই ছড়িয়ে পড়ল শহর এলাকায়।

শান্তিপ্রিয় নির্বিবাদী ছা-পোষার দল শহর ছেড়ে পালাতে থাকে। তিনটি দলের সমর্থকরা জয়ধ্বনি দেয়, বন্দুক হাতে ছুটে বেড়ায় অপর পক্ষকে হত্যা করতে।

লুয়ান্দার দুর্গে বসে পর্তুগীজ হারমাদরা বোধহয় হাসছিল।

যুদ্ধ জাহাজে বসে অ্যাডমিরাল কার্ডোসো এখন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আলোচনা করছে। এদিকে তিন পক্ষের সৈন্যরা লুয়ান্দা দখলের লড়াইতে রক্তপাত ঘটাচ্ছে। তখনও তিনপক্ষের ভাগ্য অনির্দিষ্ট।

আলোচনা সভায় কিছু স্থির হোক আর না হোক ঝগড়াটা চরম আকার ধারণ করল।

রোবের্টোর প্রতিনিধি এবং সাভিমবির প্রতিনিধি বার বার অভিযোগ করতে থাকে ডাক্তার নেটোর বিরুদ্ধে। একটি বিষয় স্পষ্ট হল, রোবের্টো এবং সাভিমবি উভয়েই ডাক্তার নেটোর বিরোধী।

এই আলোচনা বিফল হলেও রোবের্টো ও সাভিমবি বুঝেছিল ডাক্তাব নেটোই দেশের প্রধান শত্রু এবং তাকে বিতাড়িত করতে হলে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাবা স্থির করল, সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে ডাক্তার নেটোকে তারা বিতাড়িত করবে।

ডাক্তার নেটোর মূল ঘাঁটি ছিল কঙ্গোতে।

কঙ্গো থেকে সৈন্য আনতে জাইরের ভূখণ্ড অতিক্রম করতে হবে। অবশ্য সামান্য পথ। এখানেই তাদের বাধা দিতে পারলে জাইরের প্রেসিডেন্ট মোবুতু তাদের সাহায্য করবে।

সমরনীতি স্থির করার আগেই ডাক্তার নেটোর বাহিনী গোপন পথে রাশিয়ান অস্ত্র নিয়ে নিকটবর্তী তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ কেবিনা (Cabina) দখল করে ঘাঁটি শক্তিশালী করেছে। তারা এগিয়ে গেছে লুয়ান্দার কাছে। রোবের্টোর বাহিনীর মুখোমুখী হয়েছে ডাক্তার নেটোর বাহিনী। উভয়পক্ষ শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করছে।

রোবের্টো পরিমাপ করতে পারেনি ডাক্তার নেটোর শক্তি। সাভিমবি বাহিনী দক্ষিণ অঞ্চল দখল করছে, তখনও তারা লুয়ান্দা থেকে একশত মাইল দূরে। লুয়ান্দার উপকণ্ঠ বলতে যা বুঝায় সেখানে সাভিমবির সৈন্যরা এসে পৌঁছায় নি।

ডাক্তার নেটোর বাহিনী কেবলমাত্র সুশিক্ষিত নয়, তাদের সাহায্য করছে কিউবান সৈন্যবাহিনী। সঙ্গে তাদের রয়েছে রাশিয়ার ১২২ মিলিমিটার রকেট। এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সামনে রোবের্টোর বাহিনী দাঁড়াতে পারছে না। ক্রমেই তারা পিছু হটছে আর ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। এগিয়ে চলছে ডাক্তার নেটোর সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী।

সাভিমবি তার বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য জোর তলব জারী করেছে।

ডাক্তার নেটোকে লড়াই করতে হচ্ছে দুটো অমিত বিক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে। তার শত্রুরা আমেরিকা ও দক্ষিণ আফরিকার সাহায্যপুষ্ট। তাদের মোকাবিলা করতে হলে একসঙ্গে দু দলের সঙ্গে মোকাবিলা না করে, একদলকে উৎখাত করে অপর দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যে কোন উপায়ে সাভিমবির বাহিনীকে পথে আটক করতে হবে।

ব্রাণ্ট্ আর সেক্কু ছোট একটা সৈন্যদল নিয়ে গোপন পথে সাভিমবির বাহিনীর গতিরোধ করতে এগিয়ে গেল। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল কোন প্রকারে যেন রোবের্টো আর সাভিমবির বাহিনী একত্রিত হতে না পারে।

ব্রাণ্ট্ দক্ষিণ-পূর্বদিকের পথ ধরে এগোতে থাকে। সেক্কু এগোতে থাকে দক্ষিণ পশ্চিমদিকের পথ ধরে সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দর-শহর কব্জায় রাখতে।

ব্রাণ্টের বাহিনী মালাঙ্গি পৌছবার আগেই খবর এল রোবের্টোর বাহিনী লুয়ান্দার উপকণ্ঠ ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে।

সেক্কু তখনও থামেনি। আর তিরিশ মাইলের মধ্যে সাভিমবির সৈন্যবাহিনী। এই বাহিনী এগিয়ে চলেছে লুয়ান্দার দিকে। সেক্কু সংবাদ পাঠাল ব্রাণ্টকে। যত সত্বর সম্ভব ব্রাণ্ট যেন তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে সাভিমবির বাহিনীর গতিরোধ করতে।

ডাক্তার নেটো লুয়ান্দা দখল করেই সর্বপ্রথম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। তার শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী তখন এগিয়ে চলেছে সাভিমবির অগ্রসরমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে। গৃহযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে লুয়ান্দা দখলের যুদ্ধে FNLA এবং UNITA উভয় সম্মিলিত হবার আগেই ডাক্তার নেটোর সাফল্যলাভ বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিল। (The crucial event in the civil

war Dr. Neto's coup last August in which he succeeded in driving the two rival nationalist movements out of Luanda.—Brogan.)

সাভিমবির বাহিনী অগ্রসর হতে পারে নি। তিরিশ মাইল পথ এগোবার চেষ্টা করেছিল ঠিকই কিন্তু আঘাতের পর আঘাতে তারা পিছু হটতে হটতে একেবারে নোভা লিসবনে পৌঁছে গেল। পাশার দান ফেলে সাভিমবি অথবা রোবের্টো কেউই প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করতে পারল না। লুয়ান্দা এবং নিকটবর্তী কয়েক হাজার বর্গমাইলে ডাক্তার নেটোর প্রশাসন কায়েম হল।

ডাক্তার নেটো বুঝেছিল এই দখলদারীকে স্থায়ী না করতে পারলে কোন ক্রমেই অ্যাঙ্গোলায় সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন কায়েম করা সম্ভব নয়। বিশেষত, পর্তুগীজরা যদি দেখে লুয়ান্দা হাত বদল হচ্ছে তা হলে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করবে এবং কার হাতে ক্ষমতা দেবে তার স্থিরতা নেই। পর্তুগীজ শাসকরা যাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবে আইনত বিশ্ব-রাজনীতিতে তাদের সরকার আইন সম্মত সরকার বলে গৃহীত হবে। রাজনীতি, সমরনীতি ও কূটনীতির খেলায় সামান্য ভুল করলেই ব্যর্থতার বেদনায় শুধু ভেঙ্গে পড়তে হবে এমন নয়, তার দলেরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

ডাক্তার নেটো লুয়ান্দাকে সুরক্ষিত করতে রাউণ্ড দি ক্লক শত্রু-পক্ষকে ব্যস্ত রেখে কাজ হাসিল করতে চায়। নির্দেশ গেল প্রত্যেক উপবাহিনীর কাছে, লড়াই বন্ধ কর না। শত্রুর হাত থেকে দেশের যতটা অংশ দখল করতে পার ততটাই লাভ। প্রয়োজনে যে কোন ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না।

স্বার্থসম্পন্ন বৈদেশিক শক্তির টনক নড়ল। তারা স্পষ্ট দেখতে পেল রাশিয়া তার প্রভাব বিস্তারে সাফল্য লাভ করেছে। এই সব বৈদেশিক শক্তি সমস্বরে চিৎকার আরম্ভ করল। অ্যাঙ্গোলায় বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য সোরগোল আরম্ভ করল।

রাশিয়া নিজেও চায় অ্যাঙ্গোলার যুদ্ধে নিজেকে না জড়াতে।

কিন্তু তারাও চায় আমেরিকা অ্যাঙ্গোলার হাঙ্গামায় যাতে হস্তক্ষেপ না করে।

আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফরিকা অ্যাঙ্গোলায় বামপন্থী সরকার যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার জন্য খুবই চেষ্টা করছে। তারা FNLA এবং UNITA-কে দরাজহাতে সাহায্য করছে। এমত অবস্থায় রাশিয়া চুপ করে থাকতে পারে না। তারাও দরাজ হাতে সাহায্য করছে MPLA-কে। (The Russians decided on the massive arm supply because American and South African intervention during the summer.—Brogan.) এদিকেও যেমন তিনটি পক্ষ অ্যাঙ্গোলায় ক্ষমতালাভের লড়াইতে নেমেছে, তেমনি ওদিকে তিনটি শক্তি অ্যাঙ্গোলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে নেমেছে। কোন পক্ষই পিছু হটতে রাজি নয়।

অ্যাঙ্গোলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ হল। এই খেলার মূল পক্ষগুলো রইল নেপথ্যে। রক্তের অক্ষরে স্বাধীনতা-লাভের দুঃস্বপ্নকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরল আফরিকার কালো মানুষের দল। MPLA ইতিমধ্যে লুয়ান্দা শহর ও বন্দরসহ কয়েক হাজার বর্গ মাইলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। FNLA পিছু হটতে হটতে নিরাপদ স্থানে নতুন ঘাঁটি করেছে। UNITA তখন পিছু হটে দক্ষিণের ওপর আধিপত্য স্থায়ী করতে ব্যস্ত।

আগষ্ট কেটে গেল।

সেপটেমবর এগিয়ে এল। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। শান্তি নেই কোথাও।

পর্তুগীজদের খাস ভূমিতে সরকার বদলের ধুম পড়েছে। পর্তুগালের শহরে শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভের লড়াইতে নেমেছে। গুলিগোলা চলছে মাঝে মাঝেই। FNLA এবং UNITA আশ্বস্ত হল। তাদের বিশ্বাস খাস পর্তুগালে লড়াই চললে দশই

নভেম্বর তারিখটা পিছিয়ে যাবে। তারাও যথেষ্ট সময় পাবে শক্তি সঞ্চয় করে লুয়ান্দা দখল করার। এবার এককভাবে কেউ-ই অগ্রসর না হয়ে দুইটি দল একযোগে সম্মিলিত ও সুপরিকল্পিতভাবে শত্রু বিতাড়নে আত্মনিয়োগ করবে।

নতুনভাবে আবার তারা আক্রমণ শুরু করল লুয়ান্দা দখলের।

কিছুটা অগ্রসর হয়েও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। রাশিয়ান রকেট এবং কিউবার স্বেচ্ছাসেবী সেনার সামনে তারা দাঁড়াতে না পেরে পিছু হটতে থাকে। ডাক্তার নেটোও বুঝতে পেরেছিল, লুয়ান্দার দখল না রাখতে পারলে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। লুয়ান্দাকে নিরাপদ করতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও গোপনে UNITA ও FNLA গেরিলাবাহিনী শহর ও বন্দর এলাকায় প্রবেশ করে ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলেছিল।

ব্যাপক তল্লাসী ও ধরপাকড় করেও গেরিলা আক্রমণ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। প্রতি-বিপ্লবী গেরিলাদের খুঁজে বের করতে ডাক্তার নেটোর প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সহানুভূতি। ডাক্তার নেটো এতদিন একটি কাজে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছে, সেটি হল সাধারণ মানুষকে রাজনীতি সম্বন্ধে সজাগ করা। ডাক্তার নেটোর প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিল। সেনাবাহিনীর নয় মাইল পাল্লার রকেটের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হল জন-সমর্থন লাভ করা। অবিশ্রান্তভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে চলছে MPLA-এর সদস্যরা। এর সুফল শীঘ্রই দেখা দিল।

শুধুমাত্র কালো মানুষই নয়। লুয়ান্দা ও নিকটবর্তী এলাকার শ্বেতকায় জনতার মাঝেও ডাক্তার নেটোর প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। শিক্ষিত সমাজে এবং বিশেষ করে দরিদ্র বস্তিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছিল ডাক্তার নেটো (It's chiet support has alwaye come from the educated among the Africans and coloured people and the slum-

dwellers in Luanda.—Brogan). এই সহযোগিতা ডাক্তার নেটোর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগ করে গেরিলাদের তৎপরতা বন্ধ করতে সফল হয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে যে সব গেরিলা এগিয়ে এসেছে লুয়ান্দায় তাদের গ্রেপ্তার করতে আরও সতর্কভাবে ডাক্তার নেটোর মতাবলম্বীরা অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেছে। এই ভাবে গেরিলাদের মোকাবিলা করলেও বাস্তবত লুয়ান্দা তখনও নিরাপদ এলাকায় পরিণত হয় নি। শহর ও বন্দরবাসীদের চোখে মুখে কেমন একটা আশঙ্কার ছাপ। দিনের বেলাতেও ভীতসন্ত্রস্তভাবে বাইরে বের হত অধিবাসীরা। কখন কোথা থেকে চোরা-গোলা আসবে তার কোন স্থিরতা নেই। জননী পুত্রকে স্নেহের পরশ দিয়ে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে নিশ্চিত হতে পারছিল না। কখন যে মৃত্যুর সংবাদ আসবে তার স্থিরতা নেই।

অকটোবর পেরিয়ে গেল।

পর্তুগীজদের খাস ভূমিতে নানা অশান্তি থাকলেও পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত ছোট বড সকল উপনিবেশের শাসন ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে মোটেই ত্রুটি করছিল না।

১৪৯৮ সালের পর্তুগীজ হারমাদদের সঙ্গে বর্তমান যুগের পর্তুগীজদের মনোভাব যে ভিন্ন প্রকার, চিন্তাধারা যে যুগোপযোগী এটাই প্রমাণ হল স্বেচ্ছায় উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকারে। বিগত পাঁচ শত বৎসরের সঞ্চিত পাপ থেকে পর্তুগালের উত্তর পুরুষদের রক্ষা করতে নবযুগের সন্ধান পেয়েছে পর্তুগালের সাধারণ মানুষ।

গোটা অকটোবর মাস ধরে রোবের্টো এবং সাভিমবি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছে লুয়ান্দা দখল করতে কিন্তু কোন ক্রমেই তারা লুয়ান্দার দুইশত মাইলের মধ্যে পৌছতে পাবে নি। জনসাধারণের সহায়তায় গেরিলা আক্রমণও ব্যর্থ হতে থাকে।

ডাক্তার নেটো তার অনুগামীদের সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিল

তা হল, আমরা চাই ক্ষুধা থেকে মুক্তি, তৃষ্ণা থেকে মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, বর্ণ বিদ্বেষ থেকে মুক্তি (We donot want hunger or thirst or poverty or a law of diserimination based on colour.) আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, আমরা চাই বিদেশীদের প্রাধান্যহীন জীবনযাত্রা, আমরা চাই নিজস্ব রক্ষণ ব্যবস্থা, আমরা চাই আমাদের সবকার।

ডাক্তার নেটো আবার ঘোষণা করল, যদিও আমরা কেবলমাত্র স্বাধীনতা লাভের জন্য সমাজবাদী রাষ্ট্রের সাহায্য নিচ্ছি তবুও অনেকে প্রচার করেছে, আমবা রাশিয়ার তল্পীবাহক হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই। এই মিথ্যা প্রচারে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়। আমাদের যারা সঙ্গী, যারা দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগে এগিয়ে এসেছে তারা আমাদের দেশের শিক্ষিত, দরিদ্র, অবহেলিত জনসাধারণ। আমরা তাদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছি, তারা বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত।

নভেমবর মাস এসে গেছে।

এক-দুই করে স্বাধীনতা লাভের দিন এগিয়ে এল।

পর্তুগীজ হাই কমিশনার অ্যাডমিরাল লিওনেল কার্ডোসোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ডাক্তার নেটো।

অ্যাডমিরাল বলল, পর্তুগীজ সরকার তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর।

আমরাও রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে প্রস্তুত।

আপনার শত্রু পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। ছুটো পক্ষই যথেষ্ট বলশালী। ওটা আপনার দায়িত্ব।

ওটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। যারা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ডেকে আনতে চায় তাদের মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য আমাদের আছে। ত্বরিত গতিতে তাদের, আমরা বিতাড়িত করছি। রোবের্টোর সমর্থক কেবলমাত্র জাইরের নিকটবর্তী

অঞ্চলের সামান্য কিছু উপজাতীয়। সাভিমবির সমর্থকও দক্ষিণের কিছু উপজাতীয়। এদের অস্ত্র সজ্জিত করেছে কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। রোবের্টো তার ভগ্নীপতির ভরসায় যুদ্ধে নেমেছে, আর সাভিমবি সবচেয়ে ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফরিকার মারফত আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছে। এদের মোকাবিলা আমরা করছি। অচিরেই তাদের নির্মূল করতে পারব, এই ভরসা আমাদের আছে।

অ্যাডমিরাল বলল, এগার তারিখের জিরো আওয়ারে আমি আপনাদের হাতে অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত তুলে দিয়ে বিদায় নেব। প্রার্থনা করি, আপনারা সুখী সমৃদ্ধ অ্যাঙ্গোলা গড়ে তুলুন।

ডাক্তার নেটো ফিরে এসে স্বাধীনতা উৎসবের প্রস্তুতি করতে নির্দেশ দিল জনসাধারণকে।

লুয়ান্দার পথঘাট সাজানো হল।

তোরণ সাজানো হল।

এগার তারিখের জিরো আওয়ার!

অ্যাডমিরাল লিওনেল কার্ডোসো সাংবাদিকদের ডেকে পাঠাল। ডাক্তার নেটো তার সহকর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হল লুয়ান্দা দুর্গে।

অ্যাডমিরাল ঘোষণা করলেন, আমি পর্তুগাল সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নামে ঘোষণা করছি। এই মুহূর্তে অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতা লাভ করল।

অ্যাডমিরালের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ শীর্ষ থেকে পর্তুগালের পতাকা নামিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ শীর্ষে তোলা হল MPLA-এর লাল-কালো জাতীয় পতাকা। দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করে শহরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হল স্বাধীনতার ঘোষণা। সঙ্গে সঙ্গে লুয়ান্দার আপামর জনসাধারণ উন্মাদের মত আনন্দে ছোটাছুটি করতে থাকে। পাঁচশত বৎসরের অভিশাপ থেকে মুক্ত হল অ্যাঙ্গোলার মানুষ।

অ্যাডমিরাল আরও ঘোষণা করল, আজ থেকে অ্যাঙ্গোলার সার্বভৌমত্ব দেশের জনসাধারণের উপর বর্তালো।

("In the name of the President of the Partuguese Republie, I solemnly proclaim with effcet from zero hours on November 11—the independence of Angola and its full sovereignity vested in the Angolan people.")

ঘোষণার শেষে অ্যাডমিরাল নেমে এল তার আসন থেকে।

শহরের অবস্থিত সমগ্র পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অ্যাডমিরাল বন্দরের দিকে। সেখানে পর্তুগীজদের যুদ্ধ জাহাজ অপেক্ষা করছিল। অ্যাডমিরাল তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ জাহাজে উঠলেন। তার সঙ্গে আরও পাঁচখানা যুদ্ধ জাহাজ চলল পর্তুগালের দিকে।

অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটল।

পর্তুগীজ বাহিনী সান পেদ্রো দুর্গ ত্যাগ করে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে MPLA বাহিনী দুর্গের দায়িত্ব গ্রহণ করল। সর্বত্র তাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হল।

অ্যাঙ্গোলা বেতার থেকে ঘোষণা করা হল, আজ থেকে অ্যাঙ্গোলা সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এর প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ডাক্তার আগাষ্টিনহো নেটো।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বাদ্যসহ মিছিলের পর মিছিল বের হল শহরে। আকাশে ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে উদ্দাম নৃত্যগীত আরম্ভ হল।

অ্যাডমিরাল লিওনেল কার্ডোসোর রণতরী বাহিনী তখন ধীরে ধীরে অ্যাঙ্গোলার সংরক্ষিত সমুদ্র সীমা ছেড়ে এগিয়ে চলেছে পর্তুগালের দিকে।

পাঁচ

From the early days of Portugüese settlement when conditions were such that very few Portuguese women could be induced to accompany adventurers, who filled this gap by taking African women as companions but the women were virtually never legal wives.

'এম-ভি জলযান' ভেসে চলছে। ইনজিন বন্ধ। ক্যাপটেন কোন রকমে জাহাজ যাতে গতি-পথচ্যুত না হয় তার চেষ্টা করছে।

জাহাজের প্রত্যেকটি যাত্রী দুশ্চিন্তায়। তখনও কোন সাহায্যকারী জাহাজ এসে পৌঁছায়নি। জাহাজের ইনজিনিয়াররা গলদঘর্ম। যদি কোন প্রকারে জাহাজকে চালু রাখা যায় তা হলে নিকটবর্তী কোন বন্দরে আশ্রয় পেতে পারে।

ইনজিন ঘরে কাজ করতে করতে মিসাউদি বার বার মীরচান্দানীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু হাসছে।

মীরচান্দানী বলল, হাসছ কেন মিসাউদি ?

তোমার মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে। তুমি খুবই ভীত হয়েছ মনে হচ্ছে। জাহাজের চাকরির অর্থ জীবন নিয়ে খেলা। প্রাণের মায়া থাকলে কেন জাহাজের চাকরি নিলে। তোমার মনের ছবি আমার মনে ফুটে উঠছে। তাই হাসছি। তোমার জন্য দুঃখ বোধ করছি, কিন্তু নিরূপায়।

মীরচান্দানী বলল, বন্ধু মরতেই হবে একদিন কিন্তু অপমৃত্যুকে স্বাগত কেউ জানাতে চায় কি ? তোমরা হারিকিরি কর, তাই মৃত্যুটা

তোমাদের কাছে ছেলে খেলা। আমরা সনাতনপন্থী দেশের মানুষ। আমরা মৃত্যু ভয়ে ভীত নই ঠিকই, কিন্তু স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাই না।

মিসাউদি মীরচান্দানীর বক্তব্য যেন শোনে নি এমন ভাবে বলল, তোমার হাতের স্ক্রুটা আরও একটু টাইট দাও। আরে মরা-বাঁচা সমান। ঐ স্ক্রুটা যদি ঠিক কাজ করে তা হলে আমরা বাঁচলাম না হলে মরলাম। এদিকে বেশি নজর দাও। সিঁড়ি দিয়ে কে নামছে দেখতো। আরে রোজারিও। কি খবর বন্ধু?

রেডিও অফিসার রোজারিও বলল, মেহনত করে লাভ নেই। একটা রাশিয়ান জাহাজ এগিয়ে আসছে আমাদের ভবনদী পার করতে।

আর কোন খবর আছে?

এত বড় সুখবরের পর আর কি খবর থাকতে পারে? দ্বিতীয় বিশেষ খবরটা ধরবার চেষ্টা করছিলাম। ভয়েস অব আমেরিকার খবর কিন্তু ঠিক ধরা গেল না।

মিসাউদি বলল, বন্ধু হে, তোমার যেমন বুদ্ধি! খবর ধরতে হলে নিকটবর্তী কোন স্টেশন পাকড়াও কর। ভয়েস অব আমেরিকার চেয়ে স্পষ্ট খবর পাবে। বি-বি-সি ট্রাই কর। এই অগাধ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ডাঙার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার কাজ তোমাকেই যখন করতে হয় তখন আর কিছু হোক বা না হোক সংবাদগুলো সঠিক ধরতে চেষ্টা কর।

রোজারিও বলল, সব সময় সব দেশের খবর ধরা যায় না। সময়মত নিশ্চয়ই ধরব। সে সব যাক। রাশিয়ান জাহাজটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে। টোয়িং করে কোন বন্দরে পৌঁছে জাহাজ মেরামত করাতে যদি পার তখন খবরের দাম থাকবে। আর যদি এভাবে ভাসতে ভাসতে চলতে হয় অন্য কোন খবরই খবর মনে হবেনা। সবই বিস্বাদ মনে হবে।

অবশ্যই, অবশ্যই, বলে মিসাউদি আবার নিজের কাজে মন দিল। জাহাজের মিস্ত্রিরা তাকে সাহায্য করতে থাকে। পাশে গ্লাস ভর্তি উগ্র পানীয়। মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে নিজেকে সতেজ করে নিচ্ছিল।

মীরচান্দানী সারারাত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে চায় বিশ্রাম। মিসাউদিকে বলল, আমাকে কয়েক ঘণ্টার ছুটি দিতে পার কি মিস্টার মিসাউদি ?

মোলায়েম সুরে মিসাউদি বলল, আমি বুঝছি তুমি খুব ক্লান্ত। মনের দিক থেকেও তুমি খুব সতেজ নও। তুমি থার্ড ইনজিনিয়ারকে পাঠিয়ে দিয়ে বিশ্রাম কর। আমিও ক্লান্ত। অবশ্য আমার মন ক্লান্ত না হলে দেহের ক্লান্তি বোধ থাকে না। কোন কাজ আরম্ভ করে যতক্ষণ শেষ করতে না পারি ততক্ষণ আমার দেহ এবং মন মোটেই ক্লান্ত হয় না। আচ্ছা তুমি যাও।

মীরচান্দানী নিজের কেবিনে ফিরে এসে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তা সে নিজেও জানেনা, ডাক্তার জোনাসের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, কি খবব ডাক্তার জোনাস ?

খবর বুঝতে পারছ না ?

বুঝতে পেরেছি। জাহাজ চলছে। মেরামতি শেষ হয়েছে বুঝি।

না হে না। মেরামতি শেষ হবার আগেই রাশিয়ান জাহাজ এসে পৌঁছেছে। আমাদের জাহাজকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

তা জানি না। নিকটবর্তী কোন বন্দরে নিশ্চয়ই। তবে সেখানে পৌঁছতেই আরও তিন চারদিন কেটে যাবে। এবার সবাইয়ের বিশ্রাম। তুমিও স্নান-টান করে খেয়ে দেয়ে সুস্থ হও। খুব খাটুনি গেছে গত দু তিন দিন। কোন স্টিমুলেণ্ট দরকার আছে কি ?

এখনও দরকার হবে না ডাক্তার।

শরীরটাকে চাঙ্গা রাখ মীরচান্দানী, মনটাও চাঙ্গা থাকবে।

আগে স্নান করে আসি, দেখি শরীর কেমন থাকে। তুমি বস ডাক্তার। আমি এখুনি আসছি।

মীরচান্দানী স্নান করতে গেল। ডাক্তার জোনাস চুপ করে বসে থাকতে থাকতে সামনের রেডিওটা খুলে দিতেই বি-বি সির খবর স্পষ্ট শোনা গেল।

পর্তুগীজ সরকার অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। লুয়ান্দার শাসন ক্ষমতা দখল করেছে ডাক্তার নেটোর দল MPLA কিন্তু সেখানে শান্তি নেই। সেখানে গদী দখলের জন্য গুরুতর লড়াই চলছে। (struggle to seize power continues in Angola.)

ডাক্তার জোনাস আনন্দে উৎফুল্ল। আফরিকার দুটো মাত্র উপনিবেশ বাদে সবগুলোই আজ স্বাধীন ও পশ্চিমী শক্তির কবলমুক্ত হয়েছে।

সোমালী আফরিক্যান ডাক্তার জোনাস পরাধানতার বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছে তার নিজের দেশে। ইংরেজ, ফরাসী ও ইতালীরা তাদের দেশকে দখল করে রেখেছিল শতাধিক বৎসর যাবত। তারাও স্বাধীনতা লাভ করেছে শতবর্ষের ত্যাগে ও প্রচেষ্টায়। অ্যাঙ্গোলার মানুষও পাঁচশত বৎসর ধরে পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করেছে। অ্যাঙ্গোলা দখল করে পর্তুগীজরা যে ভাবে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া কঠিন। প্রতি ইঞ্চি জমি কালো মানুষের রক্তে রাঙ্গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ কি ভাবে চলেছে তার ইতিহাস যদি কোন দিন লেখা হয় তাহলে সেই ইতিহাস পাঠ করে পাঠক সমাজ শিহরিত হবে।

গভীরভাবে চিন্তা করছিল ডাক্তার জোনাস।

কি ভাবছ ডাক্তার? স্নান সেরে এসে মীরচান্দানী জিজ্ঞাসা করল।

উৎফুল্লভাবে ডাক্তার জোনাস বলল, আজ আমাদের সুদিন। অ্যাঙ্গোলা গতরাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে। শেষ পর্তুগীজ সৈন্য অ্যাঙ্গোলা ত্যাগ করে চলে গেছে।

সত্যি ?

হাঁ ভাই, সত্যি। এই মাত্র বি বি সির খবর শুনলাম। আজকের টপ্ নিউজ হল অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতালাভ। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আরও দুঃখ জমায়েত আছে অ্যাঙ্গোলার কপালে। অ্যাঙ্গোলা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে ভাষ্যকার বলল, "actually western intelligence analysis predicted the Angolan civil war might turn out to be another Vietnam—but for Russia, not the U S A" অ্যাঙ্গোলার এই গৃহ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আরেকটা ভিয়েতনামে পরিণত হতে পারে, এবার রাশিয়াকেই আমেরিকার অবস্থায় পড়তে হবে। অর্থাৎ রাশিয়ার পরাজয় ঘটবে স্নায়ু যুদ্ধে।

বেয়ারা খাবার এনে টেবিলে রাখল।

পেছন পেছন এল মিসাউদি।

মীরচান্দানী খাবারের প্লেটে মনোযোগ দিতেই ডাক্তার বলল, কি খবর মিসাউদি ?

তোমরা যে খবর নিয়ে আলোচনা করছ, সেটাই খবর। অ্যাঙ্গোলার গৃহ যুদ্ধ। দ্বিতীয় ভিয়েতনামের আশঙ্কা। আমরা কিন্তু অ্যাঙ্গোলার কোন বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করতে বাধ্য হব মনে হচ্ছে। ওদের জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করে এটাই বুঝেছি।

তোমার বুঝি ভয় ?

মোটেই নয়। আমরা জলে বাস করে কুমীরকে ভয় করব কেন ? আমরা জাহাজী, আমাদের মৃত্যু তো যে কোন সময় হতে পারে। ভয় নয় ভাবনা।

আমিও ভাবছি মিসাউদি। শেষে যদি অ্যাঙ্গোলা গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয় আর রাশিয়াকে নাকে খত দিয়ে ফিরে আসতে হয় তা হলে বিরাট একটা সম্ভাবনাময় জাতীয় জীবনে তমসা নেমে আসবে। এটাই ভাবছি ডাক্তার।

তা হবে না মিসাউদি। রাশিয়া ঠেকে শিখেছে। রাশিয়া মিশরে যে সাহায্য পাঠিয়েছিল সেই সাহায্য কার্যকরী হয় নি। তাদের অস্ত্রশস্ত্র সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে না পারায় মিশরকে নাকে খত দিয়ে ইস্রায়েলের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। রাশিয়াকে প্রথম পরীক্ষা দিতে হয়েছিল স্পেনে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তাদের অস্ত্র স্পেন অবধি পৌঁছায়নি। পথেই মুসোলিনী ইতালীয় দরিয়াতে আটক করেছিল রাশিয়ার দেওয়া অস্ত্র। বেনামে যুদ্ধ চালোনাতে খুবই অসুবিধা। অস্ত্র দিলেই তার সদ্ব্যবহার করা যায় না। এটা রাশিয়া জানে, সেজন্য তাকে অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

মীরচান্দানী খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করল, সেই পন্থাটি কি ?

রাশিয়ার আশঙ্কা MPLA তাদের নতুন ধরণের মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। এর ফলে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সেজন্য তারা কিউবাকে এই যুদ্ধে নামিয়েছে। কিউবার সুশিক্ষিত সৈন্যদল MPLA-এর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। (The Soviet feared that the MPLA would be unable to use the sophisticated weapondry that Moscow was supplying since Russians were unwilling to send in troops themselves, they pressured the Cubans into doing so. Time.)

ঘটনার গতি লক্ষ্য করে তবেই এ বিষয়ে স্থির মতামতে পৌঁছান সম্ভব। নানা জনে নানা কথা বলছে, কোনটা কতটা সত্যি তা নিরুপণ বর্তমানে অসাধ্য। স্বাধীনতালাভ যে কোন পরাধীন জাতির পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আমরা এই সংবাদেই উৎফুল্ল, পরবর্তী ঘটনা নির্ভর করছে দেশের জনসাধারণের ওপর।

ডাক্তার জোনাস নিশ্চিন্তভাবে বলল, অবশ্য আনন্দিত হবার কথা। পরাধীন জাতি যে কত নির্যাতন ও লাঞ্চনা সহ্য করে তা তোমরা জান না।

মীরচান্দানী বলল, জানি। আমাদের ইতিহাস এই দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। আড়াই হাজার বছর আগে আলেকজাণ্ডার এসেছিল তারপর থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা একের পর একজন এসেছে, জনসাধারণকে শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে, আড়াই হাজার বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে করতে কেমন একটা দাসত্ব সুলভ মনোভাবের বশ্যতা স্বীকার করেছি আমরা। আমরাও জানি।

সুদূর অতীতের কথা ভুলে যাও মীরচান্দানী। তোমরা স্বাধীনতা লাভ করেছ ইংরেজের কাছ থেকে। ইংরেজের অত্যাচারে আর পর্তুগীজদের অত্যাচারে অনেক তফাৎ। আমরাও বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে বাস করেছি, ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পরিচয় আছে কিন্তু আমিও কৃষ্ণাঙ্গ, সেজন্য অপর পরাধীন কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বেদনাকে আমি যতটা অনুভব করি, অতটা তোমরা করনা। সেজন্য পর্তুগীজ শাসনের তিক্ত নক্কারজনক চেহারা তোমরা জানতে পারনি। সে যে কত ভয়ঙ্কর, কত মর্মস্পর্শী তা বলে বুঝানো যাবে না।

মীরচান্দানী খাওয়া শেষ করে বলল, চল আমরা সবাই ডেকে চেয়ার পেতে বসি। সেখানে বসে গল্প করব: আকাশ পরিস্কার, বাতাসও বেশ মিষ্টি, শীতের আমেজ রয়েছে, যন্ত্রণা নেই। সারা রাত বসে কাটাতেও কোন অসুবিধা হবে না।

প্রস্তাব মন্দ নয়। চল আমরা ডেকে চেয়ার পেতে বসি।

তিনজনেই কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে চেয়ার পেতে বসল।

মীরচান্দানী বলল, এবার ডাক্তার জোনাস তুমি তোমার অসমাপ্ত কাহিনী আরম্ভ কর। তুমি আফরিকার মানুষ, তুমিই ভাল বলতে পারবে এদেশের কথা।

ডাক্তার জোনাস বলল, আমরা ইংরেজ শাসনাধীন ছিলাম তাতো বলেছি, পর্তুগীজ শাসনাধীনে যারা থেকেছে তার অবস্থাই বলছিলাম।

পর্তুগীজরা এসেছিল ব্যবসা করতে।

কিসের ব্যবসা? লুটপাট আর বাটপারির ব্যবসা।

ওরা এসে বলল, আমরা ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে এসেছি, আমাদের ব্যবসা করার সুযোগ দাও। আমরাও লাভবান হব, তোমারাও লাভবান হবে।

মন্দ কথা নয়।

কৃষ্ণকায় শাসকরা খুশী মনেই সম্মতি দিয়েছিল। অবশ্য বিনিময়ে তারা পর্তুগীজদের কাছ থেকে পেয়েছিল দামী দামী নজরানা।

অচিরেই পর্তুগীজরা বুঝতে' পেরেছিল, এই অন্ধকার দেশের মানুষ বর্তমান যুগের উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রের খবরও জানেনা, প্রশাসন ব্যবস্থাও মোটেই সফল নয়। সুযোগ বুঝে তারা সারা দেশের মানচিত্র তৈরী করে চলাচলের পথঘাট জেনে নিল, গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে জেনে নিল স্থানীয় শাসকদের সামরিক ক্ষমতা কত, তারপর শুরু করল জমি সংগ্রহ করে শ্বেতকায়দের উপনিবেশ তৈরী, গোপনে অস্ত্র আমদানা করে শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরী করে স্বমূর্তি প্রকাশ করল।

শীঘ্রই দেখা গেল পর্তুগীজরা বন্দুকের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কৃষ্ণকায়দের। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেই পর্তুগীজরা তাদের কঠিন শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করল অধিকৃত অঞ্চলে। এই সব অঞ্চলের অন্যতম হল অ্যাঙ্গোলা।

এখানেই শেষ নয়।

পর্তুগীজরা তাদের ব্যবসা বুদ্ধি ছাড়তে পারেনি। তারা মেতে উঠল নতুন ব্যবসায়ে। কৃষ্ণকায়দের ঘরে ঘরে উঠল ক্রন্দনের রোল।

কেন?

হাজার হাজার কৃষ্ণকায়কে শেকলে বেঁধে বিদেশে রপ্তানী করার পবিত্র দায়িত্ব বহন করছিল পর্তুগীজ হারমাদরা। দাস ব্যবসাই পর্তুগীজদের বড় ব্যবসা। (there was no traffic carried on except slaves).

নারী পুরুষ নির্বিশেষে পাঠানো হত উত্তর অথবা দক্ষিণ আমেরিকায়। শ্বেতকায়দের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য এদের শুধুমাত্র এক বেলা নিকৃষ্ট ধরণের খাবারের বিনিময়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খেত-খামারে মেহনত করতে হত। এইভাবে পশ্চিমী শক্তিরা শুধুমাত্র পশুবলকে আশ্রয় করে মানুষের বাঁচার জন্য সর্বনিম্ন দাবীটুকু অস্বীকার করেছে। যে সব ক্রীতদাস অক্ষম অথবা দুর্বল হয়ে পড়ত তাদের অনাহারে মৃত্যু বিনা অন্য কোন পথ ছিল না এই সব তথাকথিত সুসভ্য পশ্চিমী শ্বেতকায়দের কৃপায়। যারা কোন রকম আপত্তি করত অথবা কাজে গাফিলতি করত তাদের কপালে জুটতো অমানুষিক প্রহার আর অনাহার। বন্দী ক্রীতদাসরা কেঁদেছে, অত্যাচারে অবিচারে জর্জরিত হয়েছে কিন্তু তাদের আর্তনাদে কারও হৃদয়তন্ত্রীতে সামান্যতম স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারেনি।

সারা বিশ্বের তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহ ছিল এই অত্যাচারের কৌতূহলী দর্শক। ওরা দেখেছে, চড়া দামে মানুষ কিনেছে, জাহাজ ভর্তি করে দেশ বিদেশে এই সব মানুষদের চালান দিয়েছে। জাহাজ ভর্তি এই সব কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের আহার্য দেওয়া হত শুকনো ভুট্টা অথবা গম্। এরা সেই আহার্য চিবিয়ে আর জল খেয়ে সমুদ্র যাত্রা শেষ করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাত।

পৃথিবী‍র হাওয়া বদল হতে থাকে।

বিশ্বজনমত বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে। পর্তুগীজ হারমাদরা বিশ্বজনমত উপেক্ষা করতে পারেনি। তারা নতুন আইন করল। সদম্ভে ঘোষণা করল, ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ।

কিন্তু!

যারা চুক্তিমূলে ক্রীতদাসত্ব মেনে নিয়েছে তাদের আরও পাঁচ বছর কাজ করতে হবে তাদের পুরাতন মনিবদের কারখানায়, খেতে-খামারে।

এই প্রহসনের তাৎপর্য জানে শুধু আফরিকার কালো মানুষ।

ডাক্তার রুদ্ধকণ্ঠে বলল, এই তো গেল দাস ব্যবসায়ের ঘৃণ্য চিত্র। আরও রয়েছে। কত যে মর্মান্তিক ও ভীতিপ্রদ এই সব ঘটনা শুনলে তোমরা চমকে উঠবে।

পর্তুগীজরা এসেছিল বণিকের ছদ্মবেশে। এদের অধিকাংশই ছিল সমাজবিরোধী। এরা সবাই পুরুষ, সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক ছিল না।

আফরিকার কালো কুৎসিত উলঙ্গ অথবা অর্ধ উলঙ্গ নারীদের রূপের বিচার তারা করে নি, তারা সর্বতোভাবে যৌবনকে উপভোগ করতে উন্মাদের মত শান্তিপ্রিয় নিরীহ গৃহস্থের ঘরে আগুন জ্বালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি।

বনের মাঝে মাঝে ছোট্ট গ্রাম। পনর বিশটি পরিবার নিয়ে কোন উপজাতি হয়ত বাস করছে। তারা নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট, বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। শান্ত পরিবেশে শান্ত তাদের জীবনধর্ম। সারাদিন মেহনত করে রাতের বেলায় আঙ্গিনায় আগুন জ্বেলে সবাই মিলে নৃত্যগীতে মত্ত থাকে। এমন সৌন্দর্যবিভূষিত গ্রাম্য পরিবেশকে কলুষিত করতে ত্রুটি করেনি পর্তুগীজ হারমাদরা।

প্রকাশ্য দিবালোকে একদল হারমাদ হঠাৎ ঢুকে পড়ল এই রকম কোন গ্রামে। হয়ত পুরুষরা কাজে ব্যস্ত, হয়ত বা তারা ঘরেই ছিল। হারে-রে করতে করতে হারমাদরা প্রথমে আটক করত গ্রামের পুরুষদের, যারা বাধা দিত তাদের ভাগ্যে থাকত প্রহার অথবা মৃত্যু।

তারপরের ঘটনা কখন পশুরাজ্যেও দেখা যায় নি।

এগার থেকে একষট্টি বৎসরের নারীদের টেনে নিয়ে আসত প্রকাশ্যস্থানে। স্বামী পিতা অথবা পুত্রের সম্মুখে খোলা ময়দানে একের পর একজন তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করত। পশু জগতেও এটা সম্ভব কিম্বা সন্দেহ। এদের মধ্যে যারা অল্প বয়সী তাদের

টেনে নিয়ে যেত। এই সব হতভাগিনীদের স্থান করে দেওয়া হত বেশ্যালয়ে।

অনেকে ঘরেও নিয়ে যেত এই সব নারীদের। বাস করত স্বামী-স্ত্রীরূপে কিন্তু কখনও তারা স্ত্রীর মর্যাদা দিত না এই সব নারীদের। এদের সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় চিরকালের মত তমসাবৃত থাকত। নারীর অধিকার ও মর্যাদা দেবার কোন আগ্রহ তো ছিলই না; বরং যখন এরা ভোগের অযোগ্য হত তখন তাদের বিতাড়িত করত। আশ্রয়চ্যুত এই সব নারীরা শুধুমাত্র দেহপণ্যজীবি হয়ে বাঁচার গ্লানিতে নিষ্পেষিত হত।

মর্যাদাবোধ যাদের থাকে তারা আত্মত্যাগ করে নিষ্কৃতি পেয়েছে। শত শত এমন ঘটনা ঘটেছে যা শুনলে গা শিউরে ওঠে। গর্ভবতী নারীর উদর কেটে সন্তান হত্যা করেছে, জননীকেও প্রাণ দিতে হয়েছে সেই সঙ্গে।

প্রতিরোধকারী নারীর স্তন কেটে নেওয়া সর্বকালীন ঘটনা।

এই হল দেশের নারী পুরুষের অবস্থা।

আদিম প্রবৃত্তি মেটাবার আর শোষণ চালাবার যে সব দৃষ্টান্ত রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের দেহে ও মনে তার পরিচয় আজও পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ আফরিকার শ্বেতকায় সম্প্রদায় আজও কৃষ্ণকায়দের সামাজিক কোন মর্যাদা দেয় না, রাজনৈতিক মর্যাদা তো অনেক দূরের কথা।

এ হেন অসহনীয় অবস্থার মাঝ দিয়ে আফরিকার কালো মানুষদের জাতীয়তাবোধ জেগেছে। আজ দিকে দিকে যে জাগরণের বাজনা শোনা যাচ্ছে তা আর কিছুই নয়, পশ্চিমী শক্তির ওপর জমায়েত ঘৃণা থেকে জন্মলাভ করেছে।

তবুও কিছুতেই চুপ থাকতে পারছে না পশ্চিমী শক্তিরা। নাইজেরিয়াতে আমেরিকা তিন তিনবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাদের পোষা জন্তুকে গদীতে বসাতে চেষ্টা করেছে। সাফল্য লাভও করেছে কয়েকবার। তবে তা সাময়িক। এখনও আফরিকার

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে কোন ত্রুটি করছে না।

আমাদের সুসভ্য করে গড়ে তুলতে পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে এল মধ্য এশিয়ায় বাইবেলের ধর্ম।

তারা শাসকদের অর্থপুষ্ট হয়ে এবং বিশেষ ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ আফরিকান গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করতে থাকে। তারাই শোনাল বাইবেলের মধুর বাণী, যীশু ঈশ্বরের পুত্র। যীশুতে প্রেম কর, মুক্তিলাভ করবে।

মুক্তি! কিসের?

রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি নয়। ইহকাল থেকে মুক্ত হয়ে পরকালে অপার সুখশান্তি লাভ করতে মুক্তিলাভ।

অজ্ঞ মানুষরা বুঝল না।

যারা বুঝেছিল তারা হেসেছিল মনে মনে। বাইরে কিছুই তারা বলতে পারেনি কিন্তু তাদের জ্বালা ভুলে যাবার অমোঘ ঔষধ যে যীশু নয় সে সত্যটি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল।

ইহজন্মে ভাত জুটল না, আশ্রয় জুটল না, শিক্ষা জুটল না, নারীর সম্মান নষ্ট হল, আর সুখ শান্তি জুটবে মৃত্যুর পর। এমন তামাসা করতে পারে শুধু সাম্রাজ্যবাদী আর পুঁজিবাদীরা। সাম্রাজ্য রক্ষার বড় হাতিয়ার ধর্মের মাদকতা, শোষণের বড় অস্ত্র হল ধর্মের নামে মানুষকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা।

রাজার ধর্মই ধর্ম।

আমাদের রাজা ক্যাথলিক। আমাদের ধর্ম ক্যাথলিক। তোমরা তার অনুগত প্রজা। তোমাদের ধর্মও হবে ক্যাথলিক ধর্ম।

অজ্ঞ, নিরক্ষর কৃষ্ণাঙ্গ আফরিকানদের অধিকাংশই মেনে নিল পাদরীদের এই গছিয়ে দেওয়া ধর্ম। প্রেম পুরুষ যীশুর ভজনা করেও আমরা শ্বেতাঙ্গদের কাছে যা পেলাম তা হল অত্যাচার, অবিচার লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা।

মিসাউদির চোখে ঘুম নেমে এসেছে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আবার কাল শুনব, বড়ই ঘুম পেয়েছে।

ডাক্তার জোনাস কথা বন্ধ করে মিসাউদির ইচ্ছাকে সমর্থন জানিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল।

গুড্‌নাইট মীরচান্দানী।

মীরচান্দানী বসে বসেই বলল, তোমাদের মঙ্গল কামনা করি।

ওরা দুজন চলে গেলেও মীরচান্দানী চেয়ার চেপে বসে রইল। রাত তখন আড়াইটা বেজে গেছে আকাশের তারাগুলি মিট মিট করে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। সামনের জাহাজ তখনও কর্মব্যস্ত। এই জাহাজের ক্যাপটেন ভিন্ন অপর কোন আফসারের আর নড়া-চড়ার কোন লক্ষণ নেই। জাহাজের গতি ঘণ্টায় পাঁচ সামুদ্রিক মাইল। অতি ধীরে সংর্কতার সঙ্গে 'জলযান' জাহাজকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে রাশিয়ার মালবাহী জাহাজ।

ডাক্তার জোনাস কথিত কাহিনীগুলো মীরচান্দানীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তার অলস দেহ এবং মনের ওপর কেমন একটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিল আফরিকার কৃষ্ণকায়দের দুর্ভাগ্য কাহিনী। তার মন ফিরে গেল কোন এক সুদূর অতীতে। মনে হল, সে-ও এই সব হতভাগ্যদের একজন। মনে হল একদল শ্বেতাঙ্গ প্রভু যেন তাকে চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করছে।

কার যেন অর্তনাদ শুনতে পেল!

কাঁদছে কোন নারী। অত্যাচার জর্জরিত ধর্ষিতা নারীর করুণ কণ্ঠ। সে যেন বলছে, আমাকে বাঁচতে দাও, মানুষের মত বাঁচতে দাও।

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেল। তন্দ্রা ছুটে গেল। মীরচান্দানী ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সতেজ করে নিজের মনেই বলল, দুত্তোর! স্বপ্ন!

আমি কি পাগল হয়ে গেলাম! কেউ তো কাঁদছে না। সাগরের জল এসে আঘাত করছে জাহাজের গায়ে। তারই ছলছলানি কানে ভেসে আসছে। সামনের জাহাজটা আলোয় আলোময়। জাহাজের আলো সাগর তরঙ্গের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। রাতের আঁধারে আলোর এই খেলা অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে মীরচান্দানীর মনে কেমন একটা আনন্দের প্রলেপ দিতে থাকে।

জাহাজের ওপর মীরচান্দানী একাকী পায়চারী করতে থাকে। অন্ধকারের সৌন্দর্য তাকে হাতছানি দিয়ে কেমন উন্মনা করে তুলেছে।

পেছন থেকে কে যেন ডাকল, মীরচান্দানী!

ফিরে দাঁড়াল মীরচান্দানী। কাউকে দেখতে পেল না। মৃদু পায়ের শব্দ তার কানে ভেসে এল। অশরীরি কেউ নয়, মানুষ নিশ্চয়ই! গম্ভীরভাবে মীরচান্দানী প্রশ্ন করল, কে?

আমি, আমি রোজারিও, রেডিও অফিসার।

তুমি ঘুমাও নি?

না! তুমিও?

রোজারিও কাছে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে দুজন দুজনকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। মীরচান্দানী এগিয়ে এসে রোজারিওর কাঁধে হাত রাখল।

কিছু নতুন সংবাদ আছে কি?

আছে। সবেমাত্র রেডিওতে খবর পেলাম, লুয়ান্দা থেকে আঠার মাইল দূরে এসে গেছে FNLA বাহিনী। লুয়ান্দার পতন আসন্ন। MPLA-এর দুর্ভাগ্যের সূচনা।

যুদ্ধের গতি ওভাবে নির্ধারিত হয় না বন্ধু। শেষ ভাল, সব ভাল। এই হল যুদ্ধ। হঠাৎ কারও পতন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। জানতো, জার্মানে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বিজয় উৎসব পালন করছিল হিটলারের তাঁবেদাররা। কারণ? কারণ,

স্টালিনগ্রাদের পতন ঘটেছে। বার্লিন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হল, স্টালিনগ্রাদে জার্মানসৈন্য রাশিয়ার প্রতিরোধ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যখন এই ঘোষণা করা হল, বিজয় উৎসবে বার্লিন শহর মেতে উঠল তখন স্টালিনগ্রাদে হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে এক ইঞ্চি জমির দখল নিতে। স্টালিনগ্রাদের ভাগ্য তখনও অনিশ্চিত। তারপর? স্টালিনগ্রাদেই সবচেয়ে অসম্মানজনক পরাজয় ঘটেছিল জার্মানসৈন্য বাহিনীর। এই পরাজয়ই জার্মানযুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। জার্মানের পরাজয় নিশ্চিত হয়েছিল স্টালিনগ্রাদে। সেজন্য লুয়ান্দার ভাগ্য স্থির কিভাবে হবে তা বলা কঠিন।

তোমার কথা অস্বীকার করছিনা কিন্তু MPLA-এর সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আজকের খবর মোটেই আশাপ্রদ নয়। FNLA এবং UNITA তাদেব ব্যাক্তিগত কলহ ভুলে সম্মিলিত ভাবে সর্বত্রই MPLA-এর বিরুদ্ধে লড়ছে।

এর উল্টোটা এক সময় হয়েছিল বন্ধু। এক সময় MPLA এবং UNITA স্থির করেছিল তারা কোয়ালিশন সরকার গড়বে অ্যাঙ্গোলায়। কার্যকালে দেখা গেল সাভিমবি সবচেয়ে ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্য নিয়ে অ্যাঙ্গোলা দখলের চেষ্টা করছে। এর ফলে MPLA এবং UNITA-তে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। আবার নতুন করে মিত্রতা কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে! আদর্শগত মিল নেই কারও। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তি স্বার্থ যেখানে প্রবল, যেখানে সমষ্টির চিন্তা নেই সেখানে অতি সামান্য কারণেই বিপদ দেখা দিতে পারে। এই কারণেই এরা তিনটি দল একত্র হতে পারে নি। পারবেও না।

আমার মনে হয় এভাবে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ অনুচিত।

মীরচান্দানী বলল, এটা আমার তোমার কথা নয় বন্ধু। পৃথিবীর যাবৎ চিন্তাশীল মানুষই এই কথা বলছে কিন্তু তাতে হস্তক্ষেপ বন্ধ হয় নি। হবেও না। আজ তো ভূমি দখলের লড়াই নেই। আজ

চলেছে বাজার দখলের লড়াই। এই লড়াইতে যার জয় হবে সেই পাবে অনুন্নত দেশের বাজার। পাবে কাঁচা-মালের খনি। সেজন্য নেপথ্যে যারা বসে আছে তাদের কোন দায় নেই অথচ তারা গোপনে দায়িত্ব বহন করে। দক্ষিণ-আফরিকা তো সৈন্য পাঠিয়ে তার তাঁবেদারকে রক্ষা করতে নেমেই পড়েছে।

দক্ষিণ-আফরিকার এত মাথা ব্যথা কেন?

সে কথা আজ আর আলোচনা করব না ভাই। আমরা আদার ব্যবসায়ী জাহাজের খবর নিয়ে তো লাভ নেই। কাল ডাক্তার জোনাসের কাছে শোনা যাবে। সে এদেশের লোক, এদেশের মানসিকতার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত।

রোজারিও বলল, তাই ভাল। তুমি তো শুতে যাবে?

যাব। তবে ঘুম হবে না। আজ ডাক্তার জোনাস আফরিকার যে সব ঘটনা আমাদের শুনিয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আমার মনে। ভাবতেই পারছি না কি ভাবে এবং কি মনোবৃত্তি নিয়ে পর্তুগীজরা বন্য-পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ধরণের অত্যাচার করেছে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

রোজারিও অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের আলো-অন্ধকারের খেলা দেখছিল।

সকাল হতে আর দেরী নেই।

মারচান্দানা তাকিয়ে দেখল পুবের আকাশ। বলল, এমন সুন্দর প্রভাতকে স্বাগতম জানাও রোজারিও। নির্মল আকাশ, সমুদ্র শান্ত। ঊর্মিমালা শ্বেতাম্বর ধারণ করেছে, ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটছে, এবার রক্তাম্বর রবি সমুদ্রের কোল থেকে মুখ তুলে আমাদের অভিনন্দন জানাবে। বন্ধু, এই সুন্দর সকালকে আমরা দু'জনে স্বাগত জানাই।

ছয়

South Africa's direct intervention in the Angolan civil war may turn out to be its most serious foreign policy blunder for years.

ক'দিন অবিশ্রান্ত চলার পর জাহাজ এল লুয়ান্দা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। জাহাজের ক্যাপটেন সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে। লুয়ান্দা বন্দরের পরিবেশ কতটা নিরাপদ তা জানার জন্য চেষ্টা করছে। তখনও আশাব্যঞ্জক কোন জবাব আসে নি shore establistment থেকে। লড়াই চলছে। কোথায় এবং কি রকম তা কেউ জানে না। রেডিওতে যে সব সংবাদ আসছে তার ওপর ভিত্তি করে লুয়ান্দা বন্দরে প্রবেশ করা উচিত হবে না। বিদেশী বহু জাহাজ লুয়ান্দা বন্দর ছেড়ে এসে দূর সমুদ্রে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করছে।

রাশিয়ান-জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ থাকলেও তারাও বলতে পারছে না কোথায় গিয়ে তাদের ভাসানো তরী ভেড়ানো হবে। তাদের নির্দেশ মত 'জলযানে'র অফিসাররাও অনির্দিষ্টের দিকে নজর রেখে চুপ করে তাসপাশা খেলে দিন কাটাচ্ছে। এক দুই করতে করতে আরও সাতটা দিন কেটে গেল।

জাহাজের পারসারকে ডেকে খোঁজ নিল ক্যাপটেন। রেশন ও জল যথেষ্ট আছে তো?

তা আছে স্যার, তবে জলের রেশনিং করতে হবে।

মানে?

মানে এখানে কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তা তো জানা যাচ্ছে না। এখন আমরা খোঁড়া, আমাদের একমাত্র পথ চলার যষ্ঠি হল

সামনের ওই রাশিয়ান জাহাজ। তাদের মতলব জানি না। কোন নির্দিষ্ট কথাও তারা বলতে পারছে না, অথবা বলছে না। ওদের ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে পানীয় জলের সমস্যা তো দেখা দিতে পারে। তবে ওদের জাহাজ থেকে কিছুটা সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবুও সতর্ক থাকা উচিত মনে করছি।

সমুদ্র পথের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হল জল। জলের অনুপস্থিতির আশঙ্কা থাকলে সতর্কভাবে জল খরচ করতে হয় এটা সবারই জানা। জলযানেব যাত্রী সবাই আজ নির্ভরশীল। নিজেদের ইচ্ছামত চলাচল করাব সামর্থ্য নেই। নইলে কয়েকশত মাইল এগিয়ে ডাকারে পৌঁছে জল সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টজনক হত না। কোন অজ্ঞাত কারণে রাশিয়ান জাহাজটি আগেও যাচ্ছে না, পেছনেও ছুটছে না। তাদের মাল আছে লুয়ান্দাতে খালাস করার উপযোগী। একাজ অবশ্যই পবে করা যেত, তা না কবে অগাধ সমুদ্রে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ।

বোজাবিও খুবই ব্যস্ত। সব সময়ই বেতার সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায ব্যস্ত। বিশেষ করে লুয়ান্দার খবর পেতে বেশি উদ্‌গ্রীব। সাতদিন কেটে আটদিন কেটে যায যায় এমন সময় রাশিয়ান জাহাজ থেকে সঙ্কেত এল, প্রস্তুত হও

জাহাজ আবাব চলবে। এবাব নিশ্চয়ই কোন বন্দরে গিয়ে আশ্রয় পাবে। রাতেব অন্ধকারে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। ক্যাপটেন তাব আসনে স্থির হয়ে বসে। অফিসাররা সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জাহাজীরা তৎপর হয়ে উঠেছে। এমন সময় আকাশে হঠাৎ মেঘের আবির্ভাব অনেকের মনেই দুশ্চিন্তার ছাপ দিল।

মীরচান্দানী আর মিসাউদি জাহাজের সম্মুখের ব্রীজে দাঁড়িয়ে। ক্যাপটেন কম্পাসে চোখ রেখে মাঝে মাঝে দূরবীণ তুলে নিয়ে সামনের দিকে দেখছে।

আমরা কি নিরাপদে কোন বন্দরে পৌঁছাতে পারব মিসাউদি?

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল মীরচান্দানী। তার মুখের ওপর তিনতলার কেবিনের মৃদু আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল মিসাউদি মীরচান্দানীর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

মিসাউদি বলল, নিরাপদে পৌঁছতে পারব কি না জানি না, তবে বন্দরে পৌঁছাব ঠিকই। আমাদের জাহাজকে যে জাহাজ টোয়িং করছে তার প্রয়োজনেই আমরা বন্দরে পৌঁছব। নিরাপত্তার কথা কেন ভাবছ মীরচান্দানী। সমুদ্র কোন সময়ই নিরাপদ নয়, আমরা তো অশান্ত এলাকায় এসে গেছি। অর্থাৎ আমরাও অশান্তির ভাগীদার হতে হয়ত বা বাধ্য হব।

মীরচান্দানী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ভাবছ মীরচান্দানী? দেশের কথা? ঘরের কথা?

কোনটাই নয়। ভাবছি অশান্তির কথা। এই অশান্তিতে কেন জড়িয়ে পড়ল এই অ্যাঙ্গোলা সেটাই ভাবছি। আমরাও চলেছি সেই অ্যাঙ্গোলাতে, অশান্তির ভাগীদার হতে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল, বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ। এর মধ্যে দক্ষিণ-আফরিকার হস্তক্ষেপে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে।

মীরচান্দানী বলল, দক্ষিণ-আফরিকার প্রধানমন্ত্রী জন ভোরস্টার হিসাব ঠিকই করেছে মনে হচ্ছে। অবশ্য হিসাবটা তার নিজস্ব। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনরূপ জ্ঞান যার আছে, যে ব্যক্তি পৃথিবীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সে ব্যক্তি কখনই ভোরস্টারোর মত হঠকারিতা দেখাত না। তিনটে ভাগে বিভক্ত হয়েছে অ্যাঙ্গোলা। একটি দলের সমর্থক মোবুতু উগ্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী। অপর দলের সমর্থক ভোরস্টার যতটা কম্যুনিষ্ট বিরোধী তার চেয়ে বেশি ভীত কম্যুনিষ্ট মতবাদের অগ্রগতিতে। অ্যাঙ্গোলায় যদি রাশিয়ার সমর্থিত দল সরকার গঠন করে তথা দেশের রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা হলে সেই সরকার নিশ্চিত দক্ষিণ-আফরিকার বর্ণ-বিদ্বেষী সরকারের বিরোধী হবে।

মিসাউদি গম্ভীরভাবে বলল, এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

অবশ্যই। একদিকে শ্বেতাঙ্গ বিরোধী মোজাম্বিক সরকার অপর দিকে শ্বেতাঙ্গ বিরোধী অ্যাঙ্গোলা সরকার যদি সারাদিন হাতিয়ার উঁচিয়ে বসে থাকে তা হলে সবার আগে আঘাত আসবে দক্ষিণ-আফরিকার প্রোটেকটরেট নামিবিয়ার ওপর। অ্যাঙ্গোলা থেকে দলে দলে যদি কৃষ্ণাঙ্গ গেরিলা নামিবিয়াতে প্রবেশ করে তা হলে দক্ষিণ-আফরিকার সাম্রাজ্য ভেঙ্গেপড়া মোটেই আশ্চর্য নয়। সেজন্য ভোরস্টার প্রথমেই ঠিক করল তার অনুগত কাউকে অ্যাঙ্গোলার গদীতে বসাবে। এ ব্যাপারে ডাক্তার সাভিমবিকে উপযুক্ত লোক মনে করলেও ভোরস্টার ভেবে দেখল, একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর ভরসা করলে ভুল হবে। সেজন্য শ্বেতাঙ্গদের পরিচালনায় দক্ষিণ-আফরিকার সৈন্য পাঠিয়েছে অ্যাঙ্গোলায়। সাভিমবির পক্ষে লড়াই করছে দক্ষিণ-আফরিকার সৈন্য।

যে ভুল আমেরিকা করেছিল ভিয়েতনামে সেই ভুল করছে দক্ষিণ-আফরিকা অ্যাঙ্গোলায়। রাশিয়ার অস্ত্রের সম্মুখে এবং কিউবান সৈন্যের সামনে ভোরস্টারের বাহিনী দাঁড়াতে পারবে এমন ভরসা করা যায় না।

ঠিক বলেছ মিসাউদি। রাশিয়ার পক্ষে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া নিশ্চিত সুখের নয়।

রাশিয়া ঠকে শিখেছে। তাই তার অস্ত্র ব্যবহারের যোগ্য কিউবান সৈন্য নামিয়েছে যাতে মিশরের মত দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে না হয় ডাক্তার নেটোকে। এ দিক থেকে রাশিয়া বোধহয় ভুল করে নি।

যদি কিউবান সৈন্য আর MPLA-এর পরাজয় ঘটে তখন রাশিয়ার নিজস্ব সৈন্য নামানো ভিন্ন দ্বিতীয় পথ থাকবে না। রাশিয়া তখন নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ভিয়েতনামের মুখোমুখী হবে অ্যাঙ্গোলায়। কেউ-ই চায় না বিদেশী শক্তি এইভাবে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ

বিষয়ে নাক-গলিয়ে অশান্তিকে জিইয়ে রাখবে। কি লাভ রাশিয়ার ?

লাভ অনেক। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে অ্যাঙ্গোলার প্রয়োজন।

সেটাও স্বীকার করছি। আমার কিন্তু আশঙ্কা আছে রাশিয়ার মত শক্তির সামনে দক্ষিণ আফরিকা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। কি সাহসে তারা এই হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ভেবে পাচ্ছি না।

মিসাউদি হাসতে হাসতে বলল, তার মুরুব্বী আছে বন্ধু। দক্ষিণ আফরিকা আশা করছে আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো তাকে সাহয্যে করবে। (South Africa clearly expected to receive greater support from the United States and Western Europe).

কিন্তু আমেরিকা থেকে যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে আমেরিকা আর কোন গোলমালে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তাদের গোয়েন্দা বিভাগের সংবাদ হল, এই যুদ্ধে MPLA-এর জয় নিশ্চিত। (Many senior officials in the State Department including the Assistant Secretary responsible for Africa opposed any further American involvement in Angola on the ground that the MPLA would probably win anyway and that, that would not necessarily be a disaster.—Brogan). এমত অবস্থায় আমেরিকার ওপর ভরসা করে যদি দক্ষিণ আফরিকা এই আত্মহত্যাকারী কাজটি করে তা হলে এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছু নেই। কেন যে এই হঠকারিতা সেটা বুঝতে কারও অসুবিধা নেই কিন্তু ফলাফল হবে অতীব মর্মান্তিক। যে ম্যানডেটেড্ ভূ-খণ্ডকে নিজেদের আয়ত্বে রাখতে এত চেষ্টা, সেই ভূখণ্ডে দেখা দেবে অকল্পনীয় অশান্তি। এর আরও কঠিন পরিণতি দেখা দেবে। দক্ষিণ আফরিকার

রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেবে। রাজস্বের গরিষ্ঠ অংশই ব্যয় করতে হবে সৈন্য বিভাগের জন্য। প্রতি বৎসর এই অঙ্ক বৃদ্ধি পাবে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েলের দশা হবে দক্ষিণ আফরিকার। সব শ্বেতকায়কে বন্দুক নিয়ে ছুটতে হবে, পকেটের সব কড়ি দিয়ে সৈন্য পুষতে হবে। দেশে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে।

মিসাউদি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মীরচান্দানী জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললে কেন?

ভাবছিলাম আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। আমরা তো বিশ্বজয় করতে বের হয়েছিলাম। শেষ অবধি আমাদের পরাধীন জীবন কাটাতে হবে এটা তো সেদিনের জাপানী রাজনীতিবিদরা ভাবতে পারে নি। আমরা কি পেয়েছি বিশ্বজোড়া যুদ্ধ করে? আমাদের লাভ হয়েছিল অবিশ্বাস আর ঘৃণা। ভয় করত পরাজিত পক্ষ আবার ঘৃণাও করত, অবিশ্বাস করত। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাকে কোন দেশেই সুচক্ষে দেখে না। ঠিক এই ভাবেই দক্ষিণ আফরিকাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করবে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ। দক্ষিণ আফরিকা যে একটা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং আগ্রাসন তাদের নীতি এই সত্যটি প্রমাণ হচ্ছে অ্যাঙ্গোলায়। এর ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মনে থাকবে ঘৃণা আর ভয়-মিশ্রিত অবিশ্বাস।

মীরচান্দানী বলল, এটাই তো স্বাভাবিক পরিণতি। আবার সাভিমবির সমর্থক তো শুনছি খুবই কম। কতকগুলো বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতির ওপর তার প্রভাব আছে কিন্তু জোরদার কোন সংগঠন তার নেই। সাভিমবি ওভিমবুন্দু উপজাতির সমর্থন পেয়েছে, সে সমর্থনকে সৎকাজে ব্যবহার করার মত কোন চেষ্টাই নেই। সেজন্য এদের উপর ভরসা করা ভুল। উপরন্তু সাভিমবির সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলার বড়ই অভাব। যার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে এই সৈন্যবাহিনী কার্যকরী

কিছুই করতে পারছে না। তবে যদি ডাক্তার সাভিমবির সঙ্গে থাকত ডাক্তার নেটো তা হলে অ্যাঙ্গোলার শতকরা আশীজন মানুষের সমর্থন তারা পেত। অনৈক্যের মূলে রয়েছে সাভিমবির রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব। সে ডাক্তার নেটোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও দক্ষিণ-আফরিকার সাহায্য নিয়েছে। এর ফল সাভিমবিকে ভোগ করতেই হবে। ভবিষ্যতে দেশ ছেড়ে তাকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে যদি দেখা যায় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অর্থাৎ যুদ্ধ চলবেই। কতদিন চলবে তার সীমানা স্থির অসম্ভব। আর কথা নয়। চল এবার শুয়ে পড়ি। আমরা বোধহয় অ্যাঙ্গোলার দরিয়াতে প্রবেশ করেছি অথবা দরিয়ার মুখে। রাশিয়ান জাহাজ থেকে যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তাতে মনে হয় আজ রাতটা এইখানেই কাটাতে হবে। জাহাজের গতিও কমে আসছে ক্রমশ।

সত্যিই সিগন্যাল পাওয়া গেল রাশিয়ান জাহাজ থেকে। জাহাজ গতি রুদ্ধ করে আবার স্থানুর মত দাঁড়িয়ে গেল।

রোজারিও খবর দিল, আজ আর জাহাজ অগ্রসর হবে না। আগামীকাল সকালে স্থির হবে কোথায় গিয়ে নঙ্গর করতে হবে।

যে যার কেবিনে ফিরে গেল।

কারও মনে কোন চিন্তা নেই। সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

সকাল হয়েছে।

জলযানের মাঝিমাল্লারা দৌড়াদৌড়ি করে জাহাজের দৈনন্দিন কাজ শেষ করছে।

আকাশ পরিষ্কার। .সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে সমুদ্রের জল।

দেখতে দেখতে মধ্যাহ্ন সূর্য মাথার ওপর এসে গেল। দুটো জাহাজেরই গতি রুদ্ধ। রাশিয়ান জাহাজ থেকে দুটো বোট নামানো হল জলে। দুটোই স্পীড বোট। একটা ছুটল পূর্ব-উত্তর দিকে,

অপরটি এসে ভিড়ল জলযানের গায়ে। জাহাজ থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল। বোটের আরোহীরা একে একে উঠে এল জলযানের ডেকে।

ক্যাপটেন নেমে এসে অভ্যর্থনা জানাল তাদের। সাদরে তাদের নিয়ে গেল নিজের কেবিনে। খানাপিনার ব্যবস্থা হল। প্রায় তিনঘণ্টা পরে তারা ফিরে গেল নিজেদের বোটে। কি যে কথা হল তা কেউ জানল না। জানল, শুধু জলযানের ক্যাপটেন।

রাশিয়ান জাহাজের বোট চলে যাবার ঘণ্টাখানেক বাদে জলযান জাহাজের ক্যাপেটেন ডেকে পাঠাল তার সর্বস্তরের অফিসারদের। ক্যাপটেন তার কেবিনে বসে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন রাশিয়ান জাহাজ থেকে কয়েকজন অফিসার এসেছিলেন, অবশ্য বেতারে এই আগমন সংবাদ আগেই আমাকে জানিয়েছিল। তবে সংবাদ ছিল টপ্ সিক্রেট সেজন্য এর আগে আপনাদের জানানো হয় নি।

সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল, কেউ কথা বলল না।

ক্যাপটেন আবার বলতে থাকে, ওরা এসে আমাকে বলে গেল, ঠিক এই জায়গাতে আমাদের আরও চার পাঁচদিন থাকতে হবে। ওদের জাহাজ আজ রাতেই লুয়ান্দা বন্দরে ভিড়বে। সেখানে মাল খালাস করে তবেই আমাদের নিয়ে যাবে বন্দরে।

আমাদের একাকী ভাসতে হবে? প্রশ্ন করল মিসাউদি!

তা ভাসতেই হবে। অনেকটা বাধ্য হয়ে। আমাদের ইনজিন মেরামত, প্রপেলার মেরামত না হলে আমরা এক নট্-ও যেতে পারব না। তবে ওরা বলে গেল, আমাদের সঙ্গে বেতারে সব সময় যোগাযোগ রাখবে। যদি কোন সময় কোন বিপদ হয় তা হলে তখুনি তারা ব্যবস্থা করবে।

তাতো বুঝলাম কিন্তু আমাদের জলের অভাব, তা বলেছেন কি?

তাও বলেছি। ওদের প্রচুর জল আছে। আমাদের জাহাজের

পাশে ওদের জাহাজ ভিড়িয়ে জল দেবার ব্যবস্থা করবে। অন্তত দশদিনের মত জল আমাদের ট্যাঙ্কে দিয়ে যাবে। উপরন্তু যদি রেশন কম থাকে তাও দিয়ে যাবে। এসব ব্যবস্থা ওরা করবে। ওরা বলছিল, লুয়ান্দার অবস্থা কেমন তা সঠিক কেউ জানে না। যদি খারাপ অবস্থা হয় তা হলে ওরা পালিয়ে আসতে পারবে কিন্তু আমাদের পেছনে বেঁধে পালিয়ে আসা মোটেই সম্ভব নয়। বিপদ ঘটলে দু পক্ষই মারা যাব। তার চেয়ে ওরা অবস্থা দেখবে, সুবিধা বুঝলে মাল নামাবে। অসুবিধা বুঝলে ফিরে এসে আমাদের টানতে টানতে ডাকার পৌঁছে দেবে। লুয়ান্দার বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ নয় সে জন্য কোন গুরুতর দায় নিতে রাজি নয়।

সবারই কিছু বলার ছিল, কিন্তু কেউ কিছু না বলে একটি মাত্র প্রশ্ন করল মীরচান্দানী, আপনি কি বললেন ?

আমি রাজি হলাম। রাজি না হয়ে উপায় নেই।

সভা শেষ হবার আগেই দেখা গেল রাশিয়ান জাহাজের চেন খুলে দিয়ে জলযানকে আলাদা করা হচ্ছে। উভয় জাহাজ থেকেই ক্যাপটেনদের নির্দেশ মত চেন টেনে তোলা হল। কিছুক্ষণের মধ্যে রাশিয়ার জাহাজটা পিছু চলতে চলতে একেবারে জলযানের পাশে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান জাহাজের জাহাজীরা বিরাট হোস পাইপ হাতে করে এগিয়ে এসে কয়েকজন জলযানে উঠল। জলের ট্যাঙ্কের সঙ্গে হোস পাইপ জুড়ে দিল। পনর মিনিটের মধ্যেই জলের ট্যাঙ্কের প্রায় অর্ধেক ভর্তি করে দিয়ে ওরা বিদায় নিল। তারপরই দেখা গেল একদল জাহাজী বড় বড় কাঠের বাক্স টেনে আনছে ডেকের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রেনে বেঁধে সেগুলো জলযান জাহাজের ডেকে পৌঁছে দিয়ে নিবৃত্ত হল। জল ও রেশনের অগ্রিম ব্যবস্থা করে জাহাজটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে থাকে।

তখন সবে মাত্র সূর্যাস্ত হয়েছে।

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে নামছে।

রাশিয়ান জাহাজ এগিয়ে চলেছে কিন্তু তাতে কোন আলো জ্বলছে না। কোথাও আলো থাকলেও তা বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে না।

মিসাউদি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে ছুটে গেল ডাক্তার জোনাসের কাছে। মিসাউদিকে ব্যস্ততার সঙ্গে কেবিনে ঢুকতে দেখে ডাক্তার জোনাস ব্যগ্রভাবে বলল, কি হয়েছে মিসাউদি?

আহাম্মুখ আমাদের এই ক্যাপটেন।

কেন? কেন?

ওরা রাতের বেলায় লুয়ান্দার বন্দরে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র নামাবে তাই আমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে। রোজারিও বলল, লুয়ান্দার দরিয়াতে এবং তার আশে-পাশে আর কোন জাহাজ নেই। কেউ সাহস করে এই দরিয়াতে আসবে না। যদি কোন জাহাজ থাকত তা'হলে আমরা ডাকার যেতে পারতাম।

রোজারিও বলছিল একটা লাইবেরিয়ান জাহাজ নাকি দু শ' কিলোমিটারের মধ্যে আছে। তারা জবাব দিয়েছে।

জবাব দিলেও লুয়ান্দার জলে তারা আসবে না। আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর দিয়েই তারা নিজেদের রাস্তা করে নেবে। সমস্যা বড়ই জটিল। তার চেয়ে!

তার চেয়ে কি?

কাল আমাদের বোট নামাবো। আমরা কয়েকজন লুয়ান্দা যাব। সেখানে গেলে সব অবস্থা জানতে পারব। প্রয়োজন মত সাহায্য যাতে পাই তার ব্যবস্থা করব।

তোমার প্রস্তাব খুব খারাপ নয় কিন্তু কে কে যাবে?

আমি তুমি আর মীরচান্দানী।

ক্যাপটেনের অনুমতি নিতে হবে।

তার জন্য চিন্তা নেই। ক্যাপটেন সব বুঝেছে, কিন্তু এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে তো ছেলেখেলা করা যায় না, সেজন্য সম্মতি

দিতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের যদি বন্দরের তিন কিলোমিটার দূরে রেখে যেত তা হলে এত চিন্তা থাকত না। যাই হোক তুমি যেতে রাজি তো?

অবশ্যই রাজি। নতুন নাবিক মীরচান্দানীর মতটা জেনে নাও।

আমার বিশ্বাস মীরচান্দানী আপত্তি করবে না। আমি ক্যাপটেনের কাছে যাচ্ছি অনুমতি নিতে।

একটা পতাকা তৈরী করে নিও। MPLA-এর পতাকা।

অবশ্যই। এটা ভুল হতে পারে না।

তেসরা ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর মিসাউদির বোট অ্যাঙ্গোলার মাটি ছুঁয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বন্দর এলাকায় অন্য কোন প্রশাসন আছে বলে মনে হল না। স্থলবাহিনীর সৈন্যরা বন্দরের দায়িত্ব নিয়েছে। অদূরে ফোর্ট সান পেড্রোর মাথায় MPLA-এর পতাকা উড়ছে।

সমুদ্রের কিনারায় নতুন কংক্রিট বক্স বসিয়ে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে মারাত্মক ফিল্ড গান নিয়ে সমুদ্র পথকে শত্রু মুক্ত করতে।

অন্ধকারে আত্মগোপন করে তিনজন বন্দর থেকে কিছুটা দূরে নেমেছিল। তবুও আশঙ্কা ছিল যে কোন সময়ে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ধীরে সতর্কতার সঙ্গে তারা বন্দর এলাকা পেছনে রেখে শহরের দিকে এগোতে থাকে। শহর নির্জন। গোলাগুলির কোন শব্দ নেই। রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। পথে কোন লোকজন নেই। কেমন গা ছম্-ছম্ করছিল তিনজনের। পথ জনমানবশূন্য অন্ধকার। শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ মুখ দেখিয়ে আত্মগোপন করেছে। মাঝে মাঝে গাড়ি চলাচলের শব্দ কানে ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে বন্দর এলাকা থেকে যন্ত্রপাতি নড়া-চড়ার বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। রাতের এক প্রহর পার হয় নি অথচ এই শহরকে মৃতের শহর মনে হচ্ছিল। অনেক উঁচুতে কয়েকটা লাল বাতি দেখা

যাচ্ছিল। একটা বোধহয় সান পেড্রো দুর্গের চূড়ায় জ্বলছিল, হয়ত কোন নিষিদ্ধ স্থানের ইঙ্গিত ছিল অপরগুলোতে।

তিনজনে অতি সন্তর্পণে গলিপথ দিয়ে এগোতে থাকে।

মনে হল, কোন মানুষ অথবা জন্তু তাদের দেখে গলির আড়ালে গেল। পথ চলার সামান্য খস্‌খসানি শব্দ। তবুও তারা এগিয়ে গেল সেই ঘনঘোর অন্ধকারময় গলির দিকে। গলির মুখে পৌছতেই কর্কশ কণ্ঠে কে বলে উঠল, দাঁড়াও। আর এগোলেই মৃত্যু।

তিনজনই দাঁড়িয়ে গেল।

অন্ধকারে কে যেন এগিয়ে আসছে। তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখে মনে হল একজন বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি হাতে বন্দুক নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কোথায় যাচ্ছ ?

শহরে।

কোথা থেকে আসছ ?

আমরা জাহাজী। কাজ শেষে হোটেল খুঁজতে বেরিয়েছি।

হি-হি করে হেসে উঠল লোকটা। কি যেন নিজের মনে বলল, জাহাজী !

কোন জাহাজ ? কোথাকার জাহাজ ?

রাশিয়ান জাহাজের সঙ্গে এসেছি। বহুদিন মাটিতে পা দেই নি, ঘরের রান্না খাই নি। তাই মাটির বুকে হেঁটে বেড়াতে আর খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছি।

এস আমার সঙ্গে।

অন্ধকার গলিতে বন্দুকধারীর পেছন পেছন তারা চলল। কিছু পথ গিয়ে একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে একজনের নাম ধরে ডাকতে থাকে। তার গলার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে তিনজনের কানে ধাক্কা দিল। এত কর্কশ গলার শব্দ সে কখনও শুনেছে বলে মনে হল না।

দরজা খুলে গেল।

অন্ধকারেই লোকটার পেছন পেছন ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল। তাদের বন্দী করার জন্যই বোধহয় ডেকে এনেছে। অন্ধকার ঘরে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না।

একটা মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে একজন ঘরে ঢুকতেই সবাই সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

তিনজনের জাহাজী পোষাকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিটি বলল, তোমরা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত! এই জেম্মো, খাবার ব্যবস্থা কর। এভাবে তোমাদের আসা উচিত হয় নি। কোন সেনট্রি দেখতে পেলে তোমাদের প্রাণ যেত। আবার আমাদের শত্রুরা গেরিলাযুদ্ধের ব্যবস্থাও করেছে। তাদের হাতে পড়লেও মৃত্যু অনিবার্য ছিল। তোমাদেব সৌভাগ্য। এভাবে আসাটা উচিত হয় নি।

একটা বেঞ্চ দেখিয়ে বলল, বস।

তিনজনেই বসল। তিনজনের মুখপাত্র একজন। ডাক্তার জোনাস এদের ভাষা কিছু বুঝলেও, মোটামুটি ইংরেজিতেই তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে হচ্ছিল।

তোমরা শহরে কেন এসেছ?

আমরা দেখতে এসেছি লুয়ান্দায় কি ভাবে শাসন ব্যবস্থা চলছে।

এখন চলছে অস্ত্রের জোরে। পনের বিশদিন আগে এলে দেখতে উপকণ্ঠে চলছে লড়াই। কামানের গোলা মাঝে মাঝে শহরের এখানে ওখানে পড়েছে। এখন শত্রুরা দূরে হটে যেতে বাধ্য হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা এখনও ফেরে নি। এখানে ওখানে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাবে। শহরের এক চতুর্থাংশ লোক শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বিশেষ করে শত্রু পক্ষের অনুচররা আত্মগোপন করতে শহর ছেড়েছে।

ডাক্তার জোনাস বলল, বহু লোক আহত হয়েছে নিশ্চয়ই।

এই শহরের অধিবাসী খুব বেশি হতাহত হয় নি। তবে গোটা

দেশে আজ অবধি তিরিশ হাজারের মত লোক শুধু প্রাণ হারিয়েছে। আহতদের সংখ্যা স্থির করা সম্ভব হয় নি।

চমকে উঠল তিনজনই।

ডাক্তার জোনাস জিজ্ঞাসা করল, সবাই কি সামরিক বাহিনীর লোক।

সেই ভয়ঙ্কর লোকটি ভয়ঙ্কর হেসে বলল, না। যুদ্ধ যারা করে তারা মরে কম, যারা যুদ্ধ করে না, যারা যুদ্ধ চায় না, তাঁরাই মরে বেশি। আমাদের এখানেও তাই হয়েছে। অসামরিক ব্যক্তিদের সম্পদও নষ্ট হয়েছে কোটি কোটি ডলারের। বিদেশীরা যদি হস্তক্ষেপ না করত তা হলে এত ক্ষতি হত না।

ডাক্তার জোনাস বলল, বিদেশীর সাহায্য তো সবাই নিয়েছে।

তা ঠিক। আমরা লড়ছি আদর্শগতভাবে সমষ্টির জন্য আর ওরা লড়ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করতে। এই কারণেই বিদেশী সাহায্যের ব্যাখ্যাও অন্য প্রকার।

হয়ত তাই।

মোমবাতি হাতে করে তিনটি মেয়ে খাবার ও পানীয় নিয়ে হাজির হতেই সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিটি বলল, তোমরা খেয়ে নাও। খেয়ে বিশ্রাম। রাতের বেলায় বাইরে বের হবার কোন চেষ্টা করনা। এই বাড়িটার পেছন অংশে আমাদের হাসপাতাল। এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে জেম্মোকে ডেক। আমি বের হচ্ছি। জীবিত থাকলে কাল সকালে দেখা হবে।

তিনটি মেয়ের পরিধানে নার্সের পোশাক। মনে হল, খাস অ্যাঙ্গোলীয় নয়, বোধহয় সঙ্কর শ্রেণীর। মেয়েরা একটা টেবিল টেনে এনে খাবার সাজিয়ে দিল।

খেতে খেতে নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করতে থাকে।

রাতের বেলায় এভাবে আসাটা উচিত হয়নি।

বিপদ ঘটতে পারত।

নিরাপদও বটে। দিনের আলোতে কয়েদ হবার ভয়ও ছিল। রাশিয়ান জাহাজের কথা বলতেই আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছে। দিনের বেলায় যাচাই না করে কেউ-ই আমাদের এগোতে দিত না। এতে মন্দের ভাল হয়েছে।

খাওয়া শেষ হতেই মহিলাদের একজন থালা গেলাস উঠিয়ে নিয়ে গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, তোমরা বিশ্রাম করবে? যদি এখনই শুতে চাও আমরা এখানেই বিছানা করে দিতে পারি।

উত্তম প্রস্তাব। তোমাদের অভিরুচি।

মহিলারা চলে যেতেই মীরচান্দানী বলল, ভদ্রলোকের যুক্তিটা বড়ই কাঁচা। তোমরা রাশিয়ার অস্ত্র পেয়েছ, কিউবার সৈন্য পেয়েছে, তাই তোমরা লড়াই করছ। ওরাও আমেরিকা অথবা অন্য কারও অস্ত্র পেয়েছে তাই দিয়ে ওরা লড়ছে। মাঝখানে আদর্শের বুলিটা না জড়ালেও চলত।

সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছিল। তবুও তাদের বক্তব্য একটি মহিলার কানে যেতেই মহিলাটি ঘুরে দাঁড়াল। অতি ধীর পদক্ষেপে তাদের সামনে এসে বলল, আপনাদের আলোচনার অংশ গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই আপনারা অখুশী হবেন না।

ডাক্তার জোনাস প্রথমে উত্তর দিতে পারছিল না। কোন ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অবশ্যই আমরা খুশী হব।

আপনারা আদর্শের কথায় যেমন একটু ব্যঙ্গোক্তি করলেন। জিনিসটা বড়ই ঘোরালো। সেজন্য ঘটনাটা না বললে আদর্শ নিয়ে ভবিষ্যতে অনেকেই ধাঁধায় পড়তে পারেন।

আমরা এমন কিছু বলিনি যাকে ব্যঙ্গ মনে করতে পারেন।

অবশ্য আমারও ভুল হতে পারে। তবুও ঘটনাটা আপনাদের বলছি। যেসব বিদেশী রোবেটোর সমর্থনে এসেছে তাদের পরিচয়

হল ভাড়াটিয়া সৈন্য। যারা সাভিমবির সমর্থনে এসেছে তারা বর্ণবিদ্বেষী। আফরিকার মানুষকে চিরকাল পদানত করে রাখতে চায়। এর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমাদের সাহায্য করতে যারা এসেছে তারা অ্যাঙ্গোলার সমাজতান্ত্রিক মেহনতী মানুষের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় এসেছেন। তারা ভাড়াটিয়া লোকও নয়, দস্যুও নয়। জাইরের প্রেসিডেন্ট মোবুতু তার শ্যালকের জন্য গ্রেটবৃটেন থেকে ভাড়াটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করেছে। এদের হাতে আছে উচ্চ শ্রেণীর ধ্বংসকারী অস্ত্র। এই ভাড়াটিয়া সৈন্যদের মোবুতু এনেছে সপ্তাহে তিন শত পাউণ্ড বেতন দিয়ে। এদের কাজ হল সোভিয়েত সমর্থিত MPLA সৈন্য ও সাহায্যকারী কিউবান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। (The men are receiving £ 300 a week for fighting Soviet supported MPLA troops and their Cuban allies. The whole thing has been arranged through Zaire government.) এইসব সৈন্যদলের কোন আদর্শ আছে কি? থাকা উচিত নয়। এরা নরঘাতক গুণ্ডা। এরা পয়সার বিনিময়ে রক্তপাত ঘটাচ্ছে। যে দেশ থেকে তাদের আনা হয়েছে সেই দেশের বিদেশ-মন্ত্রীও এদের কাজ সমর্থন করেন না। (U.K. Foreign Minister Mr. Collaghan has deplored the recruitment of mercinaries. It is highly undesirable in the present circumstances.) আপনারা এবার আদর্শের কথাটা চিন্তা করুন।

কিন্তু এরা কেন এসেছে?

পয়সার লোভে। এদের অধিকাংশই হল পিতৃপরিচয়হীন কুমারী মায়ের সন্তান, সমাজে ওদের স্থান নেই। বাল্য অবধি অসামাজিক ভাবেই এরা পক্কতা লাভ করেছে। স্বদেশে ওদের স্থান হয় নি। তাই ছুটে বেরিয়েছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নরহত্যার ঘৃণ্য ব্যবসা নিয়ে। আপনারা শুয়ে পড়ুন। আরও ঘটনা জানতে

পারবেন আগামী দিনে। অ্যাঙ্গোলার মানুষ্ পরাধীনতা চায় না, তারা চায়না বিদেশী শক্তি এইভাবে অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক।

উত্তর শোনায় অপেক্ষা না করেই মহিলাটি বেরিয়ে গেল। অভ্যাগত তিনজনের মুখে কোন কথা নেই। ঘরের ছোট্ট মোমবাতিটা দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মাঝে তিনজন শুয়ে রইল। কেউ ভাবছিল, কারও চোখে তখনও ঘুম নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়বে তাহার কোন স্থিরতা নেই।

শেষ রাতে মনে হল বহুদূর থেকে কামানের শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা শুনে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে তিনজনই। রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কারও কারও কর্কশ কণ্ঠস্বরও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। রাতের ঘুম যেন অনিবার্য কারণে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। সবারই যেন কণ্টক শয্যা, পাশ ফিরে শোয়া আর মৃদুকণ্ঠে আলাপ করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না সেই রাত্রে।

সাত

The poeple's Republic of Angola would pursue an independent foreign policy on the basis of peaceful co-existence and develop universal relations with the socialist countries—
Dr. Neto

এম-ভি জলযানকে টানতে টানতে ড্রাই ডকে রেখে রাশিয়ান জাহাজ ফিরে গেছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে থাকতে হয়েছে জাহাজীদের। জাহাজ মেরামত না হওয়া অবধি সবাইকে থাকতে হবে লুয়ান্দার বন্দরে।' ডিসেম্বর কেটে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। নতুন বছরে নতুন নতুন খবর আসছে যুদ্ধ পরিস্থিতির। সবাই চিন্তিত, সবাই আতঙ্কিত অথচ অসামরিক জীবনে খুব বেশি কিছু ছেদ অথবা অনিশ্চিয়তা নেই লুয়ান্দায় এবং উপকণ্ঠে।

যুদ্ধ চলছে। কোথায় চলছে তা কেউ সঠিক বলতে পারছে না। তবে বিরাট দেশের কোথাও না কোথাও চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর বইছে রক্তের স্রোত।

এর মধ্যেই ডাক্তার নেটো ঘোষণা করল, অ্যাঙ্গোলা হল জন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই নবজাত রাষ্ট্র স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি পালন করবে। শান্তি, সহাবস্থান ও সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে দেশের উন্নতির পথে পদক্ষেপ করবে।

এই ঘোষণার পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ নেটোর সরকারকে অ্যাঙ্গোলার আইন সম্মত

সরকারের মর্যাদা দান করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হল। আফরিকার সম-মনোভাব সম্পন্ন দেশগুলোও ধীরে ধীরে ডাক্তার নেটোর সরকারকে স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করল। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ ও এশীয় দেশগুলো তখনও নীতি স্থির করতে পারে নি। তখনও তাদের বিশেষভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে, অনেকেই অপেক্ষা করছে যুদ্ধের ফলাফল দেখার।

প্রতিদিনই নতুন নতুন সংবাদ নিয়ে আলোচনা করে জলযান জাহাজের জাহাজীরা। বিশেষ করে অফিসাররা বেশি আগ্রহী। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা চলে অনেক রাত অবধি। বোধহয় শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি নেমে আসে, সবাই নিজ নিজ কেবিনে ফিরে যায়, ক্লান্ত দেহ ও মনটাকে ঘুমের কোলে এলিয়ে দেয়।

ডাক্তার জোনাস বলল, ডাক্তার নেটোর সাফল্য অধিকতর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই ভাবে অগ্রসর হতে পারলে কয়েক মাসের মধ্যে অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে, জয়ের মালা গলায় নেবে ডাক্তার নেটো।

মিসাউদি বলল, এদেশের ঘরোয়া বিষয়ে আমাদের কোন মতামত দেওয়া উচিত নয়। তাহলেও না বলে পারছি না যে ডাক্তারের জয় অ্যাঙ্গোলাকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করবে ঠিক-ই কিন্তু জয় হবে রাশিয়ায় আগ্রাসন অথবা সম্প্রসারণ নীতির। ওরা বলত, কম্যুনিজম রপ্তানী করা যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাশিয়া কিউবার মারফত কম্যুনিজম চালান করছে অ্যাঙ্গোলায়।

তুমি তো চীনের ভাষ্য শোনাচ্ছ।

নিরপেক্ষভাবে চিন্তা কর ডাক্তার জোনাস, তাহলে আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং অনর্থক তুমি বলবে না যে আমি চীনের ভাষ্য শোনাচ্ছি। যদি মোবুতু FNLA-কে সাহায্য না করত, যদি দক্ষিণ আফরিকা UNITA-কে সাহায্য না

করত, যদি রাশিয়া এবং কিউবা MPLA-কে সাহায্য না করত তাহলে কি অবস্থা হত।

মীরচান্দানী উত্তেজিতভাবে বলল, 'যদি' দিয়ে কোন বিষয়ের মীমাংসায় আসা যায় না। যা ঘটনা তাকে স্বীকার করেই সাহায্যকারী দেশগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা উচিত।

নিশ্চয়ই কিন্তু FNLA এবং UNITA যে পেছন হটছে তার কারণ তো এটা নয় যে তারা কেউই দেশকে ভালবাসেনা। তবে তাদের অগ্রগতি MPLA-এর সমকক্ষ নয়। উপরন্তু FNLA-এর ভাড়াটিয়া ইংরেজ সৈন্য অথবা UNITA-র সহচর দক্ষিণ আফরিকার সৈন্য রাশিয়ার অস্ত্রে বলীয়ান কিউবার সৈন্যদের সমকক্ষ নয়। এই শক্তির বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তাদের পরাজয় ঘটবেই ঠিক কিন্তু নীতির দিক থেকে এই পরাজয়ের জন্য যে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই তার মূল দায়িত্ব রাশিয়ার। (Moscow instigated the fatricidal war in Angola.)

বাধা দিয়ে ডাক্তার জোনাস বলল, কোন একটি বিদেশী শক্তিকে দোষারোপ কবে লাভ নেই।

মিসাউদি বলল, অবশ্য যুক্তির দিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাশিয়া যে পরিমাণ সাহায্য দিচ্ছে MPLA-কে তাতে তার বিশেষ কোন উদেশ্য সাধিত হবার আশা নিশ্চয়ই আছে।

মীরচান্দামী বলল, দক্ষিণ আফরিকা এবং জাইরের মারফত আমেরিকাও তো যথেষ্ট সাহায্য পাঠাচ্ছে FNLA এবং UNITA-কে। সেটা কেন তামরা ভুলে যাচ্ছ।

মিসাউদি উত্তেজিতভাবে বলল, রাশিয়ার সাহায্যের তুলনায় সে সাহায্য অতি সামান্য। মামুলি সাহায্য দিয়ে MPLA-র গতিরোধ সম্ভব নয়। আমেরিকার প্রশাসন সাহায্য করতে রাজি কিন্তু জনসাধারণ আবার কোন বিরাট যুদ্ধের সঙ্গে জড়াতে চায়না। সেই

জন্য মার্কিন কংগ্রেস অ্যাঙ্গোলায় সাহায্যের ব্যয়বরাদ্দ সর্বাংশে গ্রহণ করেনি। (Congress is firmly opposed to any further aid being sent to the anti-communist in Angola, and passed a Bill just befoe Christmas cutting it out of the defence budget) অবশ্য তোমরা বলতে পার, আমেরিকা নতুন ভিয়েতনাম সৃষ্টির আশঙ্কায় দরাজ হাতে সাহায্য করতে চায় না। সেটাই ঠিক। যুদ্ধটা তো বেনামে চলবে দুটো বৃহৎ শক্তির মাঝে। কু-ফল ভোগ করবে অ্যাঙ্গোলা। লাভবান হবেনা কেউ-ই। সেজন্যই আমেরিকা এত সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

ডাক্তার জোনাস বলল, এত সহজে সমস্যার সমাধান হবে কি ?

মিসাউদি হাসতে হসতে বলল, তা কখনও হতে পারে না। স্বার্থসম্পন্ন বিদেশী শক্তি চাইবে অশান্তি জিইয়ে রাখতে। আজকের খবর শুনেছ তো। সা দা তনদেইরার পতন ঘটেছে। এর বর্তমান নাম লুবানগান (Lubangan). লুয়ান্দা থেকে নয়শত পঞ্চাশ কিলো মিটার দূরের এই মূল্যবান শহরটি MPLA দখল করেছে। অপর সংবাদ হল কয়েকটি ভাড়াটিয়া বৃটিশ সৈন্য এসে পৌঁছেছে জাইরের রাজধানী কিনসাসায়। তারা FNLA পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে এসেছে।

জাইরে সরকার তাদের আটক করেছে। তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করছে।

এটা কতদূর সত্যি তা বলা কঠিন। MPLA যেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে তার দিকে, লক্ষ্য রাখলে বুঝতে পারা যায় যুদ্ধের পরিণতি কি হতে পারে। এটা নিশ্চিত MPLA জয়লাভ করবে। ডাক্তার নেটোর সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বহু বিলম্ব ঘটবে। অশান্তি জিইয়ে রাখতে দক্ষিণ আফ্রিকা অতটা আগ্রহ দেখাবে না, তারা জাইরে আর জাম্বিয়াকে

ময়দানে নামাতে চাইবে পশ্চিমী শক্তির সাহায্যে। এটা যদি হয় তা হলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে।

মীরচান্দানী বলল, তোমার যুক্তি অস্বীকার করছিনা। আমেরিকা এই হাঙ্গামায় প্রত্যক্ষভাবে জড়াবে না এটাই আমার বিশ্বাস।

সেটাই ঠিক। আমেরিকার স্বার্থ রয়েছে অ্যাঙ্গোলায়। আমেরিকার Gulf Oil Corporation অ্যাঙ্গোলার তেলের খনিগুলো পর্তুগীজ সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়েছিল, সেই লীজ এখনও বজায় আছে। অ্যাঙ্গোলার যে অংশে এই সব মূল্যবান তেলের খনি সেই ক্যাবিনা (Cabina) এখন MPLA-এর দখলে। এই তেলের জন্য আমেরিকা প্রতিবৎসর অ্যাঙ্গোলা সরকারকে পঞ্চাশ কোটি ডলার রাজস্ব দিয়ে আসছে। বর্তমানে এই রাজস্বের প্রাপক হবে ডাক্তার নেটোর সরকার। অ্যাঙ্গোলার মোট আয়ের বৃহৎ একটা অংশ হল এই তেলের রাজস্ব। মার্কিন স্বরাষ্ট্রসচিব ডাক্তার কিসিংগার এই টাকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তেল উত্তোলন কাজ বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ ডাক্তার নেটোর আর্থিক সমস্যাও এইভাবে সমাধান হবে। অপর পক্ষে আমেরিকা অ্যাঙ্গোলার বর্তমান সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য আইন সম্মত স্বীকৃতি দেয় নি। এমন অবস্থায় আমেরিকা সরাসরি নেটোর বিরোধিতা নিশ্চয়ই করবে না। উপরন্তু আমেরিকা এবার বিদেশে অস্ত্র পাঠাবার সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

তা হলে অশান্তি করবে কে ?

আমেরিকা সরাসরি না করলেও আমেরিকা পাশার দান ফেলতে ত্রুটি করবেনা। পরোক্ষে কার্য হাসিল করবে। বেনের জাত, ঢাল তলোয়ার বিক্রির বাজার থেকে হটে আসবে না ঠিকই। তাদের হাতিয়ার নিয়ে জাইরে জাম্বিয়া একটা খেল দেখাতে চেষ্টা করবে। মোবুতুর শোক তো কম নয়। তাঁর শ্যালকের পরাজয় তো তাঁর নিজের পরাজয়। এসব প্রেসটিজের ব্যাপার।

গল্পের মাঝখানে রোজারিও হাজির হতেই সবাই উদগ্রীবভাবে জিজ্ঞাসা করল, কোন সংবাদ আছে রোজারিও?

আমার বেতার ব্যবস্থা বিকল, মানে প্রয়োজন নেই মনে করে বিকল করে রাখা হয়েছে। তোমরা যদি ব্যক্তিগত খবর শুনতে চাও তা হলে বলতে পারি।

তোমার খবর তো সেই মেয়েমানুষের গল্প।

রাগ করছ বন্ধু। এই দুনিয়াতে একটাই গল্প মানুষকে অমানুষ করে তাতো জানো। মেয়ে মানুষ যেমন মানুষ করে তেমনি অমানুষ করে আমাদের মত নারী সঙ্গীহারা ব্যথিত মানুষকে। এতে চার্ম আছে, থ্রিল আছে, রোমান্স আছে। তোমরা বড়ই বেরসিক।

ডাক্তার জোনাস বলল, মাঝে মাঝে তোমাকে পরীক্ষা করে সেটা বুঝেছি। এই জন্য তোমার গল্প অর্থাৎ ব্যক্তিগত গল্প শুনতে চাইনা।

সবাই জানে রোজারিও বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই নিষিদ্ধ পল্লীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। লুয়ান্দা বন্দরে গত পনর বিশ দিন আটক থাকা অবস্থায় তাকে সহজ জীবনে কেউ পাবে এমন আশা করা বাতুলতা।

ডাক্তার জোনাস যদিও তার গল্প শুনতে গররাজী, অপর দুজন শুনতে আগ্রহী। এটা বুঝতে পেরে রোজারিও বলল, কাল বিকেলের ঘটনাই তোমাদের বলব।

কোথায় গিয়েছিলে?

শহরে।

শহর তো নিরাপদ নয়।

আমাদের মত লোকেরা নিরাপত্তার চিন্তা করে না। দেহের খোরাক জোটাতে যায়। সেজন্য গুলি গোলা মারপিট দাঙ্গা আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ বিষয়।

তারপর?

যা ভেবেছিলাম তা নয়। শহর খালি। যাদের সন্ধানে গিয়েছিলাম তারা যেন বাতাসে উবে গেছে। অনেক সন্ধান করে পেলাম কজনকে।

রোজারিও থামল।

থামলে কেন?

নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছি বন্ধু। তাই রসিয়ে রসিয়ে বলছি। মেয়ে কটাই আফ্রো-এশীয়। বললাম, আজ রাতের অতিথি আমি।

ওরা হেসেই বাঁচে না। বলল, কয়েদখানার অতিথি হতে চাও তুমি?

থমকে গিয়ে বললাম, তোমরা যদি বন্দী করে রাখ সুন্দরী তাহলে তো বর্তে যাই।

আবার ওরা হেসে বলল, বটে বটে। সাতটি বছর থাকতে পারবে কয়েদখানায়? শোনোনি বুঝি এদেশে বারাঙ্গণাবৃত্তি অচল।

তা হলে তোমরা কেন খদ্দের ধরতে দাঁড়িয়ে রয়েছ।

সেটাও বলতে হবে? আরে বাপু, পুরাণো অভ্যাস ছাড়তে পারছি না। দিনের বেলায় চুপি চুপি কিছু উপার্জনের চেষ্টা করি। রাতের বেলায় ঘরে ঘরে খোঁজ পড়ে। যদি কারও ঘরে বাইরের লোক পায় তা হলে তারও জীবন বিপন্ন হয়, খদ্দেরকেও কয়েদ করে।

মনে মনে বললাম, তোবা তোবা।

বললাম, তা হলে অতিথি সেবা করবে না?

আপত্তি নেই। তবে রাতে নয়। আছে পকেটে মার্কিনী ডলার। তোমার চেহারা আর পোষাক তো বলছে তুমি জাহাজী। ডলার নিশ্চয়ই আছে।

ডলার দিয়ে কি করবে?

আরে বাপু আমরা এখানে থাকব না। দু পাঁচ দিন পরেই আমরা

এ দেশ ছেড়ে যাব দল বেঁধে। সেখানে তো হ্যাটো-ম্যাটোর টাকা অচল। তাই বলছি, কিছু ডলার দিতে পারবে?

আবার থামল রোজারিও

থামলে কেন বন্ধু?

ফিরে এলাম ভাই।

কেন?

এ দেশের আইনকে সম্মান দেখাতে।

আর কিছু?

ওদের ডলার পিপাসা মেটাতে গেলে আমার পকেট শূন্য হবে। এই ছুটোই আমাকে বলল, এগিয়ে কাজ নেই রোজারিও, জাহাজের ছেলে জাহাজে ফিরে যাও। তাই মুখ শুকিয়ে ফিরে এসেছি।

মীরচান্দানী বলল, আর কিছু হোক আর না হোক, এ দেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থাটা কিছু জানা গেল। এখানে এই জানার পরিণাম ও পরিমাপ নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। আমরা আর পথ চলতে ঠকব না। নয় কি?

অবশ্যই, বলে মিসাউদি হাই তুলল।

ঘুম পেয়েছে?

এমন সুন্দর কাহিনী শুনলে কার না ঘুম পায়। আচ্ছা রোজারিও, তুমি তো অনেক ঘাটের জল খেয়েছ, কাউকে ভালবেসেছ কখনও। এদের মধ্যে কাউকে?

না।

শুধু আদিম প্রবৃত্তির টানেই ছুটে যাও।

বোধহয় তাই। তার সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে।

যাকে ভালবাসনা, যার ওপর তোমার অধিকার নেই, এবং তোমার ওপর যার অধিকার নেই সেখানে ও ভাবে জান্তব বৃত্তি মেটাতে যেতে লজ্জিত হও'না? বিবেক বাধা দেয় না?

তোমার ওসব নীতি বাক্য জাহাজীদের সঙ্গে মেলে না।

মিথ্যা কথা বন্ধু। আমরাও জাহাজী। ওটা বড়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। রুচিগত ব্যাপার।

মিসাউদি বাধা দিয়ে বলল, রোজারিও নিজের কথা বলেছে। আমাদের এতে বিশেষ আগ্রহ নেই। আমরা জানতে চাই অ্যাঙ্গোলার বিষয়। অ্যাঙ্গোলা আফরিকার সমস্যা নয়, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের সমস্যা। বিশেষ করে দক্ষিণ-আফরিকা আর রোডেশিয়ার সমস্যা, উভয় দেশেই সংখ্যালঘুরা কেবল মাত্র পশু-শক্তির সাহায্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ কালো মানুষদের এতকাল শোষণ ও শাসন করে আসছে। তাদের সাঙ্গাৎ ছিল পর্তুগীজরা। পর্তুগীজরা চলে যেতেই আফরিকার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ এদেরও বিপন্ন করেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ-আফরিকা তো জড়িয়ে পড়েছে। রোডেশিয়ার স্বাধীনতা-কামী জনসাধারণের সঙ্গে সংঘাত চলছে। ইংরেজ চেয়েছিল রোডেশিয়াতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ শাসন। আয়ান স্মিথ সৈন্য-বাহিনীকে স্বপক্ষে রেখে এতকাল মানবতাবিরোধী সর্বপ্রকার কাজ করে এসেছে। আফরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীন দেশ সমূহ এবার রোডেশিয়া উদ্ধারে নামছে। বিশেষ করে মোজাম্বিক হয়ে দাঁড়িয়েছে রোডেশিয়ার দুঃস্বপ্ন। আয়ান স্মিথ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে, কিন্তু শ্বেতকায়দের প্রভুত্ব কিছুতেই হানি ঘটাতে রাজি নয়। যেদিন কৃষ্ণাঙ্গ স্বাধীন দেশ থেকে হামলা শুরু হবে সেদিন রোডেশিয়ার সামর্থ্য থাকবে না দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এদের মুখোমুখী হয়ে থাকা।

ডাক্তার জোনাস কথা শেষ করতেই মিসাউদি বলল, হিসাবটা ভুল নয় কিন্তু, রোডেশিয়া আশা করছে পশ্চিমীশক্তি তাদের সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যদি রোডেসিয়া আক্রান্ত হয় তা হলে বৃটিশ সরকার কোনোভাবেই তাকে সাহায্য করবে না।

ডাক্তার জোনাস বলল, ইতিমধ্যে মোজাম্বিক—রোডেশিয়া সীমান্তে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে।

মিসাউদি গম্ভীর ভাবে বলল, এটা স্থায়ী হবে। শেষ অবধি আয়ান স্মিথকে নাকে খত দিতে হবে। শ্বেতাঙ্গ শাসনে দেশের কি অবস্থা হয়েছে তা লুয়ান্দাকে দেখলেই বুঝা যায়। কৃষ্ণাঙ্গরা চায় বাঁচতে। এই বাঁচার জন্য লড়াই করছে। এতকাল আবেদন নিবেদন করেছে, এবার হাতিয়ার তুলে নিয়েছে হাতে। শক্তের ভক্ত সবাই। এবার শক্তি পরীক্ষা হবে। এই শহরের পর্তুগীজদের এলাকা দেখলেই জানা যায় কেমন রাজার হালে পর্তুগীজরা বাস করত। আধুনিক বিশাল সমৃদ্ধ বড় বড় অট্টালিকায় বাস করত পর্তুগীজ শাসক ও শোষকরা আর তার চারপাশ ঘিরে যে শহর তার চেহারা অতি ভীতিপ্রদ। শাসকরা এই কুৎসিত দৃশ্য দেখতো শুধু গাড়ির বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে। আমরা খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। এদের নগ্নতা দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

অনেকক্ষণ সিগারেট টেনে মিসাউদি নিজেকে যেন ফিরে পেল। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগল, লুয়ান্দার পাঁচলক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ লোক বাস করে বস্তিতে। এই সব বস্তির ঘরগুলো কাঠের তৈরী, ওপরে ছাউনী করগেট টিনের। এই এলাকায় কোন আলো নেই, এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার কোন স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের ভাল ব্যবস্থা নেই। এরা অতি দরিদ্র এবং ভারবাহী পশুর মত জীবন অতিবাহিত করে। তবুও ওরা আত্ম-মর্যাদা নিয়ে বাস করতে চায়। হাস্য পরিহাস করে জীবন যন্ত্রণাকে ভুলতে চেষ্টা করে।

এই সব অবহেলিত, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষ যে কোন সময় মানুষের মত বাঁচার দাবী নিয়ে জন-সমক্ষে হাজির হবে, সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল নড়িয়ে দেবে, তা ভাবতেও পারেনি দাম্ভিক অত্যাচারী শোষক পর্তুগীজরা। অথচ এখানেই জন্ম নিয়েছিল People's Movement for the Liberation of Angola (MPLA), এই বীজ মহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করে বর্তমানে অ্যাঙ্গোলার শাসন

ক্ষমতা দখল করে 'People's Republic of Angola প্রতিষ্ঠিত করেছে। (The museques were breeding ground for the People's Movement for the Liberation of Angola (MPLA), the nationalist organisation which set itself up as the Government of the People's Republic of Angola when the Portuguese departed last November.)

এই সব বস্তি থেকেই MPLA বহু বৎসর লড়াই করেছে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে। এদের না ছিল শিক্ষার ব্যবস্থা, না ছিল স্বাস্থ্য সম্মত জীবন ধারণের ব্যবস্থা, না ছিল যথাযথ আহার্য, না ছিল আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয়। অথচ MPLA শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এদের উন্নতির দিকে সর্বাগ্রে নজর দিয়েছে। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, সর্ব নিম্ন প্রয়োজন মত আহার্যের ব্যবস্থা হয়েছে। এক দিকে MPLA লড়াই করছে দেশকে একছত্রতলে নিয়ে আসতে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, অন্য দিকে তারা অধিকৃত অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাতেও নজর দিয়েছে।

মী-চান্দানী বলল, আরেকটা এলাকায় কখনও গেছ কি তুমি ?

কোন এলাকায় ?

রাঙ্গেলে। শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ছ মাইল দূরে এই বস্তি। আমি সেদিন গিয়েছিলাম। এই বস্তি-ই বোধহয় শহর এলাকার নিকৃষ্ট বস্তি। পঁচিশ বছর আগে এখানে কয়েকটি দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ এসে বসবাস করতে থাকে। সত্ত দাসত্ব মুক্ত এই সব কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় লোক মুখে। আজ কাল এই বস্তির অধিবাসীর সংখ্যা ষাট হাজারের উপর। এখানেও পর্তুগীজরা তাদের বিলাস-বহুল বাড়ি ঘর গড়ে কৃষ্ণাঙ্গদের হটিয়ে দিতে আরম্ভ করেছিল।

বিপ্লবের সূচনায় MPLA কঠিন ধাক্কা দিয়েছিল এই এলাকায়। MPLA গেরিলাদের আক্রমণে এখানকার শ্বেতাঙ্গদের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তখন পর্তুগীজরা এলাকা ছেড়ে নিরাপদ উপনিবেশে চলে যায়। এখন এখানে গড়ে উঠছে অসংখ্য মাটির বাড়ি। সেখানে বাস করছে কৃষ্ণাঙ্গরা। এখন রাঙ্গেলের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠেছে MPLA-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

এখানে কি কাজ হয়?

এখানে Department of the Masses অর্থাৎ জনসাধারণকে সংগঠিত করার বিভাগ গড়ে তুলেছে। যাকে এক কথায় বলা হয় DOM, এখান থেকে জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিদিন অপরাহ্ণে এখানে গ্রুপ মিটিং হয়, সাধারণ সভা হয়, এই সভায় DOM-এর নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করে। DOM-এর অন্যতম নেতা Tinito উদাত্তস্বরে শুনিয়ে থাকে, আমরা সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত হয়েছি, এবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছি। (We are moving from colonial to an anticolonial phase.) বর্তমানে আমাদের কাজ হল যথাযথ রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের সমাজ গড়ে তুলব এবং জনতার মনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় দীক্ষিত করব।

এগুলো তো থিসিস কিন্তু বাস্তবে ওরা জনসাধারণের কোন কাজ করছে কি?

নিশ্চয় করছে। আমি নিজে দেখেছি, স্থানীয় সকল সমস্যা মেটাতে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। অসুস্থ লোক যাচ্ছে DOM-এর কাছে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে; শিশুদের পড়ার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ চিকিৎসক ও শিক্ষক ছিল পর্তুগীজ। ওরা এদেশ থেকে চলে গেছে। তাদের শূন্যস্থান এখনও পূর্ণ হয় নি। এর ফলে তাদের সদ্ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় তা

করে উঠতে পারছে না। কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তার ও শিক্ষক গড়ে তুলতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এই সময় MPLA নানাভাবে বিব্রত। তবুও সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছে DOM-এর মারফত।

এতে কতদূর অগ্রসর হবে বলতে পার কি?

অনেক দূর, তবে সময় সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ের উঁচুশ্রেণীর ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা দেবায় দায়িত্ব। পাঁচ ছয় বছরের ছেলেদের নিজেদেব ভাষা ও অঙ্ক শেখাচ্ছে সতর আঠার বছরেব ছেলেরা।

ডাক্তার জোনাস বলল, এ সবই তো প্রশংসার যোগ্য। আমি ভাবছি এই উৎসাহ-উদ্দীপনা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে তো? যখন ক্ষমতার মোহ জাগবে নেতাদের মনে, বিপ্লবের অগ্নিশিখা স্তিমিত হবে, স্বাধীনতার ঘোব কাটবে তখন কি থাকবে এই উৎসাহ-উদ্দীপনা?

থাকবে। আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠা থাকলে কোন আশঙ্কা নেই। তা যদি না হোত তা হলে চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, রাশিয়া এদের অধঃপতন অনেক আগেই ঘটত। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তা'ক প্রাধান্য বিস্তার করতে না দিয়ে, যদি রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হয় তা হলে এই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা দেখা দেবে না। তবে সবই অনিশ্চিত। নেতৃত্বের দৃঢ় চরিত্রের ওপব সব কিছু নির্ভর কবছে।

সাও মারিয়া এবং সাও কনসটান্স নিজেদেব বিপন্ন মনে করছে কিছুকাল যাবত।

এতকাল তারা মনে করেছিল ঐক্য বোধ জাগবে, কোয়ালিশন সরকার গড়বে দেশের মানুষ কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা গেলনা। সবাই নিজেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র, দেশেব মূল সমস্যা সমাধানে কেউ-ই আগ্রহী নয়।

FNLA-কে যতই সাহায্য করুক মোবুতু, কোনক্রমেই তারা

ক্ষমতায় আসতে পারবে না। এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কনসটানস শেষ চেষ্টা করছিল ডাক্তার সাভিমবিকে স্বমতে আনতে।

সে চেষ্টাও তাকে পরিত্যাগ করতে হল যখন সান সালভাডোরের পতন ঘটল।

সান সালভাডোরের পতন FNLA-এর সকল আশা চূর্ণ করল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের সর্বাংশ MPLA-এর অধিকারে চলে গেল। পূর্বদিকে জাইরে ও জামবিয়া সীমান্ত অবধি সকল অংশ MPLA-এর অধিকারভুক্ত হওয়াতে FNLA-এর পা রাখার কোনস্থান আর রইল না। দেশের বড় বড সকল শহর, বন্দর একটাও FNLA দখলে রাখতে পারে নি।

সাভিমবিও পিছু হটছে। তারও কোন আশা আছে বলে মনে হয় না।

হঠকারিতার জন্য রোবের্টো এবং সাভিমবির পতন ঘটছে দেখে কনসটানস ব্যথিত কিন্তু তার করার কিছু নেই।

তখনও একমাত্র শহর সাপ্রা (Sapra) সাভিমবির দখলে। এই শহর এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কোন সময়ে সুযোগ মত MPLA এই শহর অবরোধ করে সাভিমবির শেষ প্রত্যাশাকে নিষ্ফল করতে পারে।

মোবুতু উগ্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী। আঙ্গোলার নতুন সরকারকে কোনমতেই মোবুতু স্বীকার করবে না নিশ্চিত। হয়ত ভবিষ্যতে তা করতে পারে। বর্তমানে কোন সম্ভাবনা নেই। জামবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিন্তা করছে MPLA সরকারকে স্বীকৃতি দেবে কি না, সেজন্য জামবিয়ার আচরণ কিছুটা নরম ও আপোস মনোভাব সম্পন্ন। দক্ষিণ আফরিকা বোধহয় তার অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কার কথা ভাবছে।

কনসটানস আফরিকার মানচিত্রের ওপর চোখ রেখে চিন্তা করেছে অ্যাঙ্গোলার অবস্থান কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মোজামবিক যে শ্বেতাঙ্গ

লুটেরাদের হৃদ্‌কম্প সৃষ্টি করেছে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মোজামবিকের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগই পায় নি শ্বেতাঙ্গরা, এবং অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা ঘোষণার পরই লক্ষ্য করা গেল রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের বহির্গমনের একটি মাত্র পথ রয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গদের বেশি কাল অসন্তুষ্ট রাখলে এই পথও নিরাপদ থাকবে না। দক্ষিণ আফরিকার জন্য সমুদ্র পথ উন্মুক্ত থাকলেও, স্থলভাগ যে কোন সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

হীরা, ইউরেনিয়াম, খনিজ তেলের মালিকানা পেতে বিদেশীরা আগ্রহী। এতকাল তারা নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করেছে, সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে তারা চায় না ঠিকই কিন্তু ভোগ করার পথ তো খোলা নেই।

সাও মারিয়াকে সঙ্গে করে কনসটান্‌স উপস্থিত হল জোহানাস বার্গে। উদ্দেশ্য আশ্রয় লাভ। অ্যাঙ্গোলার অবস্থার গতি কোন দিকে যায় তা লক্ষ্য করে তবেই নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করবে ওরা দুজন।

বার বছর আগে কনসটানস লড়াইয়েব ময়দানে এসেছিল রোবের্টোর উৎসাহে। বনে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় পর্তুগীজ হারমাদদের সঙ্গে সমানে লড়াই করেছে। রোবের্টোর অন্যতম উপদেষ্টা ও বিশেষ দূতরূপে কাজ করেছে। সব সময় সে চিন্তা করেছে অখণ্ড স্বাধীন সুখী অ্যাঙ্গোলাব। আজ সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। আজ তাকেই আশ্রয় নিতে হয়েছে দক্ষিণ আফরিকার মত ঘৃণ্য রাষ্ট্রে। তাব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তবুও MPLA-এর সাফল্যে সে ব্যথিত নয়।

কে দায়ী এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের? আমেরিকা অথবা রাশিয়া? কার স্বার্থ রক্ষা করতে কালো মানুষেরা রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে? সবার আগে কে এই অশান্তিতে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে? আজও স্থির হওয়ার সময় হয় নি। (Whether the U. S or the

U.S.S.R was the first to step up military aid to Angolan factions is unclear.) আমেরিকা অথবা রাশিয়ার মধ্যে যে-ই প্রথম এই অশান্তিতে ইন্ধন দিক, ওদের কারও হাত যে পরিস্কার নয়, এটাও নিশ্চিত।

জোহানসবার্গের উপকণ্ঠে বন্ধু আন্তনিওর গৃহে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারে নি কনসটান্স। রোবের্টোর সামগ্রিক পরাজয় সংবাদে বিশেষ উদ্বিগ্ন অথচ করার কিছু নেই। রোবের্টো আর ক্ষমতালাভ করবে এমন কোন ভরসা ছিল না। দক্ষিণে কিছু অঞ্চলে এখনও সাভিমবির প্রভাব রয়েছে, কিছু অঞ্চল দখল করেও রেখেছে। সামরিক দিক থেকে এই অঞ্চলের বিশেষ কোন মূল্য না থাকলেও সাভিমবি চেষ্টা করছে এখান থেকেই লড়াই চালাতে।

ইউরোপীয় ভাড়াটিয়া সৈন্য ধীরে ধীরে সমবেত হচ্ছে জাইরেতে। ঠিক এই ভাবেই স্বাধীন কঙ্গো থেকে লুমুম্বাকে উৎখাত করতে ভাড়াটিয়া বেলজিয়ান সৈন্য হাজির হয়েছিল। এই ভাবেই তারা লড়াই করে শেষ অবধি কঙ্গোকে খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের মনোমত সরকারকে গদীতে বসিয়েছিল। লুমুম্বা রাশিয়ার সাহায্য পেয়েছিল, সে সাহায্য কাজে লাগাতে পারেনি যার ফলে লুমুম্বার পতন ঘটেছিল। এবার যাতে তা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাশিয়া সুশিক্ষিত কিউবান সৈন্যকে পাঠিয়েছে অন্যকোন ইউরোপীয় শক্তি যাতে কোন প্রকারে প্রধান্য বিস্তার না করতে পারে।

সংবাদ পেল কনসটান্স, জাইরে এবং জামবিয়া সীমান্তে গেরিলা বাহিনী লড়াইতে নেমেছে MPLA-এ কে বিব্রত করতে। বিব্রত করা আর উৎখাত করা এক ঘটনা নয়। যারা প্রতিরোধ করবে গেরিলাদের, তাদের সামনে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, আর যারা গেরিলা যুদ্ধের সামিল হচ্ছে তাদের সামনে উগ্র জাতীয়তাবোধের প্ল্যাকার্ড ভিন্ন আর কোন আদর্শ নেই।

এই গেরিলাবাহিনীকে উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত করতে ইউরোপের

অসমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহ ভাড়াটিয়া বিমান করে অস্ত্র বহন করে নিয়ে আসছে জাইরেতে সেই অস্ত্র রাজধানী কিনসাসা থেকে বহন করে দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার গোপন বিমানবন্দরে যাচ্ছে। সেখান থেকে জাইরে ও জামবিয়া সীমান্তের বন-জঙ্গলে গোপন ঘাঁটিতে পাঠানো হচ্ছে। এই সকল অস্ত্র আনা হয়েছিল FNLA-কে সুসজ্জিত করতে কিন্তু FNLA মুখোমুখী যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়েছে, তাদের শক্তি প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ, সেজন্যই এই সব অস্ত্র UNITA এলাকায় পাঠানো হচ্ছে। শেষ ভরসা UNITA, পশ্চিমী শক্তিসমূহ এই শেষ আশ্রয় অবলম্বন করে চিন্তা করছে অ্যাঙ্গোলায় তাদের প্রতিপত্তি ও প্রধান্য বিস্তারের।

এই সব অস্ত্রের অধিকাংশই এসেছে আমেরিকা থেকে।

সোভিয়েত টি-৫৪ ট্যাঙ্ককে ঘায়েল করার জন্য ট্যাঙ্ক ধ্বংসী অস্ত্রও এসেছে। MPLA বাহিনী সোভিয়েত ট্যাঙ্কের সাহায্যেই এগিয়ে চলেছে। এই ট্যাঙ্কের গতিরোধ করার জন্যই আমেরিকা এই অস্ত্র পাঠিয়েছে।

কনসটান্স কেমন যেন আতঙ্কিত।

সাও মারিয়াকে এই সব সংবাদ পরিবেশন করে বলল, চল এবার অন্যত্র যাই।

মারিয়া জানতে চাইল, কোথায় যাবে। তোমার বন্ধু রোবের্টের পতন হয়েছে, তার আশ্রয় নিরাপদ নয়, এদিকে সাভিমবির অবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নয়। কোথায় যাবে?

ঠিক করেছি লুয়ান্দায় যাব।

তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাবে। তোমাকে বিশ্বাস করবে না। তোমাকে হয়ত তারা কয়েদ করবে।

আশ্চর্য নয়। তবুও আমি বিশ্বাস করি, আমি সব সময়ই ঐক্যবদ্ধ করার সদিচ্ছা নিয়েই সবায়ের কাছে গিয়েছি, সবাই বিশ্বাস করবে আমি অ্যাঙ্গোলাকে ভালবাসি। ডাক্তার নেটো নিশ্চয়ই জানে ও

বিশ্বাস করে, যে মানুষ দেশ ও মানুষকে ভালবাসে সে কখনও দেশের বৈরী হতে পারে না।

দেশের বৈরী না হলেও তুমি তো ডাক্তার নেটোর বৈরী হতে পার।

তাও সম্ভব। আজ ডাক্তার নেটো আমার মত বৈরীকে ভয় করবে না। বড় জোর আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। আজ তার সমস্যা অন্য দিক থেকে দেখা দেবে। মহা শক্তিশালী আমেরিকা অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত নয়, অথচ আমেরিকাও চিন্তিত! দক্ষিণ আফরিকার নিরাপত্তার কথাই তাকে বার বার ভাবতে হচ্ছে। আমেরিকা ভাবছে কৃষ্ণাঙ্গদের এই স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত আছে দক্ষিণ আফরিকা আর রোডোশয়ার নিরাপত্তা। কৃষ্ণাঙ্গদের ততটা অবিশ্বাস করেনা, যতটা অবিশ্বাস করে কিউবান সৈন্যদের। এই কিউবান সৈন্যদের সাহায্যে যে কোন সময় আফরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীন দেশগুলো শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফরিকা ও রোডেশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। (The possibilities of Cuban-backed attack on South Africa and Rhodesia.) আজ ডাক্তার নেটোকেও এই চিন্তা করতে হচ্ছে। আমেরিকা দক্ষিণ আফরিকা ও রোডেশিয়ার নিরাপত্তার কাল্পনিক ওজুহাতে অ্যাঙ্গোলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এরজন্য প্রয়োজন যে সংহতি তাতে ফাটল ধরানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যাতে ফাটল না ধরে সে বিষয়ে আমার সহায়তাকে MPLA নেতারা মূল্যহীন মনে করবে না।

মারিয়া তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। অবশেষে স্থির হল তারা অগ্রসর হবে এবং শেষ পর্যন্ত লুয়ান্দায় নিরাপদে পৌঁছলে তখন স্থির করবে ভবিষ্যত কার্যক্রম।

অ্যাঙ্গোলার শহরে বন্দরে পর্তুগীজ সম্প্রদায় ও আফ্রো-পর্তুগীজ সম্প্রদায় বিশেষ বিপন্নবোধ করতে থাকে। পর্তুগালের সরকার

অ্যাঙ্গোলা পরিত্যাগের পূর্বেই এই দুই সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছে পর্তুগালে ফিরে যেতে অথবা অ্যাঙ্গোলার স্বীকৃত সরকারের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে অ্যাঙ্গোলার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায় তখনও মন স্থির করতে পারে নি।

হয়ত তারা মনে করেছিল অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত তাদের অভিরুচি মত স্থির হলে তারা কর্তৃত্ব করতে না পারলেও প্রভুত্ব বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। সেজন্য তাদের মনোভাব ছিল, দেখা যাক কি হয়। দ্বিতীয়ত, তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ছিল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। গণতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রের ভেক নিয়ে যদি সাম্রাজ্যবাদী অথবা পুঁজিবাদী কোন শাসন কায়েম হয় তা হলে তাদের পক্ষে নিরাপদে বসবাস করার কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। তৃতীয়ত, তাদের বিশ্বাস ছিল অ্যাঙ্গোলার তিনটি দল উপদল লড়াই দাঙ্গা করলে পৃথিবীর কোন দেশই এদের স্বীকৃতি দেবে না। বিশেষত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো নিশ্চিত মৌনভাব ধারণ করবে। এই সব নানা কারণে, উপরোক্ত দুইটি সম্প্রদায় থাকা অথবা না-থাকা কিছুই স্থির করতে পারে নি।

রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সমূহ সর্বপ্রথম অ্যাঙ্গোলার MPLA সরকারকে বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দিলেও তখনও ভরসা ছিল কেবলমাত্র রাশিয়ার অনুগামীরাই MPLA-কে স্বীকার করবে, অন্যকোন দেশ করবে না। সে বিষয়ে হতাশ হতে হল অ্যাঙ্গোলার বসবাসকারী পর্তুগীজদের ও তাদের রক্তসম্ভূত সঙ্কর শ্রেণীদের। আমেরিকার মোজামবিক, গিনি বিসাউ, কেপ ভার্দে সহ সান তোন, প্রিনসিপি দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ সমেত কঙ্গো, মালি, গায়েনা, মারিটিয়াস, মঙ্গোলিয়া এবং ইথোপিয়া MPLA সরকারকে বৈধ সরকার বলে মেনে নিতেই এই দুই সম্প্রদায় ক্রমে সজাগ হল তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে। এরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল তাদের পিতৃভূমির দিকে। পর্তুগালের রাজনৈতিক অবস্থার

উপর নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যত। এদের একটা ভীত সন্ত্রস্থ অংশ আশ্রয় লাভের আশায় দক্ষিণ আফরিকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমেই তারা সাভিমবি অধিকৃত অঞ্চলকে নিরাপদ মনে করে দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে। এই চলার পথে তাদের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি-ই পেয়েছিল। মোটেই সুখের নয় এই পথ যাত্রা। অথচ এরা নিরাপদেই বাস করতে পারত MPLA অধিকৃত এলাকায়। তাদের বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটলে এইভাবে গৃহত্যাগ করত না।

কনসটান্স আর মারিয়া বেঙ্গুয়েলা বন্দর থেকে উত্তরের পথে চলেছে। সেই পথেই মাঝে মাঝে এই সব গৃহত্যাগীদের সাক্ষাৎ পাচ্ছিল। তাদের গৃহত্যাগের কারণ সম্বন্ধে যতবারই তারা জানতে চেয়েছে ততবারই তারা নিরাশ হয়েছে, কারণ সবাই কাল্পনিক অত্যাচার অবিচারের ভয়ে ভীত, বাস্তবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি না থাকায় পলায়মান মানুষদের জন্য দুঃখবোধ করেছে, নিরুপায়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

বেঙ্গুয়েলা ছেড়ে দক্ষিণে যাচ্ছিল চারটি পর্তুগীজ পরিবার।

এদের কাছেই জানতে পারল MPLA বাহিনী রেলপথ দখল করেছে। অ্যাঙ্গোলার প্রাণকেন্দ্রগুলো ইতিমধ্যে দখল করে সেখানে অসামরিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। তাদের হিসাব মত কম করেও চল্লিশ হাজার মানুষ মারা গেছে এই গৃহযুদ্ধে, গৃহহারা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আফরিকার কালো মানুষের দল ক্ষিপ্তভাবে শ্বেতকায়দের ওপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করছে। এমন অবস্থায় তারা উত্তরে থাকা মোটেই নিরাপদ মনে করছে না। কিন্তু তারা এখনও বুঝতে চায়না, এইভাবে সমস্যা মেটানো সম্ভব কি না।

তোমরা কি চাও? প্রশ্ন করেছিল মারিয়া একটা দম্পতিকে।

উত্তরে তারা বলল, নিরাপত্তা।

কিন্তু এইভাবে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব কি?

কেন সম্ভব নয়?

তোমরা কি মনে করছ একটি এলাকা থেকে অপর এলাকায় গেলেই তোমরা নিরাপদ হবে। সমগ্র কৃষ্ণকায় বংশ সম্ভূত মানুষ শ্বেতকায় বিদ্বেষী। উপরন্তু যে দেশের সর্বত্রই লড়াই চলেছে সে দেশের কোন স্থানই নিরাপদ থাকতে পারে না। এ দেশের বনভূমিও তো নিরাপদ নয়। বন্য প্রাণী তোমাদের সংহার করবে। তোমরা যদি এদেশে বাস করতে না চাও তা হলে তোমাদের দেশে ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর যদি বাস করতে চাও তা হলে এই বিশাল দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করার চেষ্টা করাই উচিত।

আমরা সংবাদ পেয়েছি দক্ষিণ আফরিকা সরকার আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক। আমরা সেই কারণেই দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলেছি। UNITA দলের শক্তিশালী ঘাঁটি হল সেরপা পিন্টো। আমরা সেখানেই আশ্রয় নেব স্থির করেছি।

কনসটান্স আর মারিয়া আর কোন প্রশ্ন করে নি। যুদ্ধের ডামাডোলে পৃথিবীর সব দেশেই আরম্ভ হয় আসামরিক ব্যক্তিদের গৃহত্যাগের হিড়িক। এখানেও তার ব্যতিক্রম যে ঘটবে না এটা নিশ্চিত। অন্যান্য দেশে যেমন গৃহত্যাগের সময় ধন ও প্রাণহানি ঘটে এদেশেও তা ঘটছে। বন্য আতঙ্কই বেশি ক্ষতি করে। প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করার মত ধৈর্য কারও থাকেনা, বরং বলা যায় অপ্রকৃত অথবা কাল্পনিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই সব গৃহত্যাগ ঘটে এবং ধন-প্রাণহানিও ঘটে থাকে।

লুয়ান্দা পৌঁছবার আগেই কনসটান্স খবর পেল পর্তুগাল তার স্বদেশীয়দের জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তিত। পর্তুগীজ সরকারের গোপন নির্দেশে পর্তুগীজ বংশজাত শ্বেতকায়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নেবার জন্য এগিয়ে চলেছিল বন-জঙ্গল ভেঙ্গে। বন্য পশু অথবা অন্য কিছুর আশঙ্কা থাকলেও তারা দলবদ্ধ ভাবে নামিবিয়ার সীমান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হতে থাকে।

দক্ষিণ আফরিকা সরকার তাদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছে।

সীমান্ত অতিক্রম করা মাত্র তাদের নাম ধাম রেজেস্ট্রি করে বিশেষ আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা করছিল। পর্তুগীজ বংশজাত সকলেই হতাশাগ্রস্থ। তারা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল, যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিল।

এমন সময় সংবাদ এল দক্ষিণ আফরিকা সরকার পর্তুগাল সরকারের সহায়তায় এই সব গৃহত্যাগীদের পর্তুগালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। গৃহত্যাগীদের সংখ্যা দশ হাজারের মত। তাদের আকাশ-পথে পর্তুগালে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে দক্ষিণ আফরিকা সরকার। (It had organised a massive airlift in co-opretion with the Portuguese Government to take refugees from Angola to Lisbon via Namibia capital Windhock.) সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ বংশজাতদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হল, গৃহত্যাগীরা আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে চলল নামিবিয়ার রাজধানীর দিকে। MPLA সরকারও সহযোগিতার আশ্বাস দিল। যারা দেশ ছেড়ে পর্তুগালে যেতে আগ্রহী তাদের দেশে ফিরে যাবার পথ বিঘ্ন মুক্ত করতে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে থাকে।

পর্তুগীজ বংশজাত অনেকের ইচ্ছা ছিল অ্যাঙ্গোলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার। সেই জন্য তারা যুদ্ধের গতি লক্ষ্য রাখছিল। MPLA অধিকৃত অঞ্চল ক্রমেই নিরাপদ হতেই তারাও কিছুটা উৎসাহ বোধ করছিল এমন সময় MPLA সরকার নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে তাদের মনে হতাশা মিশ্রিত ভীতির সঞ্চার করেছিল।

MPLA সরকার ঘোষণা করল, প্রত্যেক সুস্থদেহী অ্যাঙ্গোলা-বাসীকে কম পক্ষেই দুই বৎসর সামরিক বিভাগে কাজ করতে হবে। আঠার থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অ্যাঙ্গোলার প্রত্যেক নাগরিককে

যুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও সামরিক বাহিনীতে দুই বৎসরের জন্য যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। দেশের মুক্তির জন্য যেমন প্রচার চলছিল তেমনি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে প্রস্তুতিও চলছিল। অ্যাঙ্গোলা আয়তনে যত বড়ই হোক তার জন সংখ্যা অতি সামান্য। উপকূলভাগের বন্দর অঞ্চলেই জন সংখ্যার অধিকাংশ বাস করে। গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন এবং ঘন বনে আচ্ছাদিত, মধ্য অঞ্চলের বহুস্থান অগম্য। এই সব গ্রামাঞ্চলে নানা উপজাতির বাস। তাদের এক পতাকা তলে নিয়ে আসার জন্যও এই আইনের প্রয়োজন হয়েছে।

মারিয়া কিন্তু ঘটনার গতিকে মোটেই খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে নি। লুয়ান্দার পথে এগিয়ে চললেও সে বারবার নানা কূট তর্ক তুলে কনসটান্সকে বুঝতে চেয়েছে, অ্যাঙ্গোলার যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে অ্যাঙ্গোলার জনসাধারণের নিজস্ব বিষয়। যে সব বিদেশী শক্তি অকারণে এই গৃহযুদ্ধের পেছনে বসে কলকাঠি নাড়ছে তারা অ্যাঙ্গোলার শুভাকাঙ্খী নয়।

পর্তুগীজ বংশজাত সবাই দেশ থেকে চলে গেলেও দেশের ক্ষতি হবে না, একমাত্র MPLA যদি অ্যাঙ্গোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাতেও দেশের ক্ষতি হবে না, এমন কি FNLA ও UNITA যদি দেশ থেকে চিরকালের জন্য উৎখাত হয় তাতেও দেশের ক্ষতি হবে না। MPLA-এর হাতে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা বর্তালেও কারও কিছু বলার নেই, তবে যদি এই তিনদলকে বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতে চলতে হয় তা হলে ভয়ানক বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

কনসটান্স এগুলো বুঝেছে এবং ঘটনা বিশ্লেষণ করে সেও মারিয়ার সঙ্গে একমত। কিন্তু লুয়ান্দা যাবার পথে এই সব যুক্তি বড়ই অকেজো। লুয়ান্দায় তার কোন বিপদ হতে পারে এটা সে বিশ্বাস করে না।

মারিয়া যেমন দক্ষিণ আফরিকা, জাইরে এবং আমেরিকার

ভূমিকার নিন্দা করেছে, তেমনি নিন্দা করেছে, রাশিয়ার ও কিউবার। মারিয়া চায় MPLA ক্ষমতালাভ করুক, কিন্তু MPLA-কে ক্ষমতায় বসাতে কেনই বা রাশিয়া ও কিউবা সামরিক সাহায্য করবে? আর কেনই বা দক্ষিণ আফরিকা, জাইরে এবং আমেরিকা FNLA ও UNITA-কে সাহায্য করবে। তার বিশ্বাস, আমরা লড়াই করব। আমরা কেন অপরের সাহায্য নেব। কিউবাকে রাশিয়া দশ হাজার সৈন্য পাঠাতে বাধ্য করেছে অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে। নীতির দিক থেকে রাশিয়ার এই কাজ মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়।

ওরাও আমাদের শোষণ করবে। সেই শোষণের ভূমিকা তৈরী করছে বন্ধুর বেশে। এক সময় পর্তুগীজরাও এসেছিল আমাদের সাহায্য করতে, আমাদের তুর্বল স্থান আবিষ্কার করে আমাদের নিজ গৃহে পরবাসী ও পরাধীন করে রাখতে তারা বিলম্ব করেনি। পাঁচশত বৎসরের এই ইতিহাস তো ভুলে থাকার মত ঘটনা নয়। আর আমরা বিদেশীদের সহ্য করব না।

কনস্টান্স বলল, আমার তোমার কথায় অথবা অভিমতে অ্যাঙ্গোলার রাজনীতির মোড় ঘুরবে না মারিয়া। ওরা যা ভাল মনে করেছে তাই হচ্ছে এবং হবে। রাশিয়া, আমেরিকা, দক্ষিণ আফরিকা এবং জাইরে সমানভাবে দোষী। সবারই নজর রয়েছে অ্যাঙ্গোলার মূল্যবান সম্পদ এবং নিরাপত্তার উপযোগী অবস্থান। ("fancy" to Angola's rich resources and stratagic position.) সবাই চায় অ্যাঙ্গোলা তাদের শক্তি সংহত করার ঘাঁটি করতে, এবং এইভাবে গোটা আফরিকায় তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে (to use the country as a "base and spring board" in further expansion in Africa.)। এই দিক বিবেচনা করলে সবাই সমানভাবে দোষী, একক ভাবে দোষী কেউ নয়।

এ নিয়ে মারিয়া আর আলোচনা করেনি। যুক্তির দিক থেকে

কনসটান্স যে নির্ভুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। যে কোন নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এটা স্বীকার করবে, কিন্তু প্রগতিশীল মন চাইবে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হোক, দরিদ্রের সেবার জন্য রাষ্ট্র চাই না, চাই দারিদ্র মোচন! যে রাষ্ট্র দারিদ্রকে বজায় রেখে দরিদ্রের সেবা করে পরমার্থ লাভ করে সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে সমাজতান্ত্রিক নয় এটা সাধারণ মানুষও বোঝে। সেজন্য রাশিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে যদি দারিদ্রমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অ্যাঙ্গোলার জন্ম হয় তাকে স্বাগত জানাবে বিশ্বের প্রগতিশীল প্রতিটি মানুষ। তবে যদি রাশিয়ার সহায়তায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে দেশের দারিদ্র মোচন না হয়ে রাষ্ট্র যদি দরিদ্রের সেবায় অর্থাৎ দান অনুদান দিয়ে দারিদ্র কায়েম রাখে তেমন রাষ্ট্রকে সমর্থন করা যায় না। এ বিষয়ে মারিয়ার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। রাশিয়ার উদ্দেশ্য কি তা না জানলেও, যদি পথটি সামাজিক গণতান্ত্রিকতার পথ নেয় তা হলে ভবিষ্যতে ডাক্তার নেটো যে একজন ডিকটেটরে পরিণত হবে না এমন ভরসা কোথায়!

বেঙ্গুয়ালা রেল স্টেশনে যে সব কুৎসিত চিত্র দেখে এসেছে তাতে আরও ভীত হয়ে পড়েছে মারিয়া। ট্রেন চলাচল অনিয়মিত। MPLA বন্দর দখল নেবার আগে ট্রেন চলাচল বন্ধই ছিল। MPLA বন্দর দখল করার পর সারাদিনে হয়ত একখানা যাত্রীবাহী গাড়ি চলছে। সেই গাড়ির প্রত্যাশায় বহু লোক বসে থাকে। মালগাড়ি দু একখানা চলছে। তাতে চলছে শুধু সামরিক রসদ ও অস্ত্র শস্ত্র। যারা গাড়ির প্রতীক্ষায় বসে থাকে তাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। এদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে শিউরে উঠেছে মারিয়া। চারিদিক নোংরা, দুর্গন্ধ, তার মধ্যে ভীত শঙ্কিত মানুষরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভীড় করেছে। কোন ট্রেনে স্থান পেলে তারা এগিয়ে যাবে দূরের কোন বনে এবং বনের আশ্রিত গ্রামে।

শিশুদের দুধ নেই। বয়স্কদের আহার্য নেই। রুগ্নদের ঔষধ নেই. পানীয় জলও অপ্রতুল।

ওরা ছুটছে বাঁচার আশায়।

সবাই হয়ত নিরাপদ এলাকায় পৌঁছতেই পারবে না। অনেকে পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। বিশেষ করে যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

আমরা যুদ্ধ চাই না।

আমরা বিপ্লব চাই না।

আমরা বাঁচতে চাই নিরাপদে এবং স্বাধীন ভাবে।

এই শ্লোগান ওদের কারও কারও মুখে।

আমরা দুঃখ সহ্য করব।

আমরা মরব।

তবুও আমরা পরাধীনতা ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি চাই।

এই শ্লোগান ওদের কারও কারও মুখে।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়? এই দুঃখকষ্ট সহ্য করেও যারা বাঁচার তাগিদে ছুটছে তাদের দিকে করুণামাখা হাত বাড়িয়ে দিতে নিঃস্বার্থভাবে কেউ এগিয়ে আসছে না। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক, কিন্তু মানুষের ধ্বংস তো কেউ চায় না। মানুষের ধ্বংস মানেই মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। কে ভাবছে এসব কথা!

আট

The war would be over in a month and that it would not in any way affect his SALT talks with the Russians.—Dr. Kissenger.

যারা আশা করেছিল অ্যাঙ্গোলার যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং যারা ভেবেছিল দ্বিতীয় ভিয়েতনামের সূচনা হচ্ছে অ্যাঙ্গোলায় তারা হতাশ হল যুদ্ধ দ্রুত পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে দেখে।

এই যুদ্ধে পশ্চিমী অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো মোটেই উৎসাহ দেখায় নি, এবং MPLA-এর অগ্রগতি দেখে তারা যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন এই সরকারকে সমর্থন জানাতে। বিশেষভাবে হতাশ হল জাইরে আর দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের আশা ছিল আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। নতুন MPLA সরকার কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করায় তারা দূরে বসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। (Angola was not a vital American interest and there was no question of an American military intervention.) অতএব এ বিষয়ে আমেরিকার আগ্রহ থাকা উচিত নয়, সেজন্য আমেরিকা সরাসরি এই যুদ্ধে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করেনি। তবুও আমেরিকা যে তোড়জোড় করেছিল তার কারণ হল রাশিয়ার অ্যাঙ্গোলা নীতি। ডাক্তার কিসিংগার বলেছেন, আমেরিকা যে সাহায্য আগে পাঠিয়েছে তার কারণ হল সোভিয়েত

অ্যাঙ্গোলায় হস্তক্ষেপ করেছিল। (Dr. Kissenger claims U.S. aid was provoked by earlier Soviet interference.) বিশ্ব-রাজনীতিতে রাশিয়ার কূটনীতি যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে বলেই মনে করা যায়। অন্তত সোভিয়েত কংগ্রেস অধিবেশনে এবার ব্রেজনেভের জয়জয়কার হয়েছে। কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে ভিয়েতনামের সাফল্য এবং অ্যাঙ্গোলার সাফল্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। ব্রেজনেভের কূটনৈতিক সাফল্য এই দেশকে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ থেকে যে মুক্ত করেছে, এটা কম গৌরবের নয়।

আমেরিকার বক্তব্য বড়ই সহজ ও সরল। আমার শক্তি আছে। সেই শক্তির পরিচয় দিতে সব সময় আমি ঘুঁষি পাকিয়ে বেড়াব এমন নয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শক্তির পরীক্ষা দিয়েছি এবং সেই পরীক্ষা দিতে আমরা প্রস্তুত. অপ্রয়োজনে আমরা একটি বুলেটও ব্যয় করতে মোটেই রাজি নই। আমেরিকার এই তুষ্ণীভাবের পেছনে যতই যুক্তি থাকুক, আমেরিকা এবার স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করতে যে এগিয়ে আসেনি, এটাই বৃহত্তর ধ্বংসের হাত থেকে অ্যাঙ্গোলাকে রক্ষা করেছে।

রাজনীতির দাবা খেলায় কে জিতল অথবা কে হারল তা স্থির করার সময় এখনও হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে খেলা দেখা গেছে তেমন কিছু অ্যাঙ্গোলায় যদি ঘটে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সম্মুখ সমরে যা ঘটল না, পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করে তা ঘটাতে সিদ্ধহস্ত আমেরিকার সিয়া (C. I. A) এবং রাশিয়ার KGB, অনেকের মতে KGB-র কর্মক্ষমতা ও প্রসার সিয়ার চেয়েও বেশি।

সব ভবিষ্যতের বুকে লুকিয়ে আছে। বর্তমানে অ্যাঙ্গোলার পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববাসীর যে শির পীড়া তার পেছনে রয়েছে আদর্শগত মতবাদের লড়াই। যারা চায় রাশিয়া প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র অ্যাঙ্গোলার প্রতিষ্ঠিত হোক তারা খুসী হয়েছে MPLA-এর সাফল্যে। আবার যারা চায় গণতান্ত্রিকতা তাদের হতাশ হতে হয়েছে। আবার

যারা চায় সম্পূর্ণভাবে কোন রাষ্ট্রের প্রভাববর্জিত সমাজতন্ত্র তারা অবশ্যই আরও অপেক্ষা করবে। কিন্তু কেউ কি এখনই অ্যাঙ্গোলার ভবিষ্যত নির্দেশ করতে পারবে? মোটেই সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝেই জলযান জাহাজের জাহাজীরা লুয়ান্দার শহরে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ায়। সামান্যতম ভীতির লক্ষণ তাদের মনে কেন যে নেই তা তারা নিজেরাও জানেনা।

রোজারিও হাসতে হাসতে বলল মীরচান্দানীকে, তোমার দেশ অ্যাঙ্গোলার MPLA সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মীরচান্দানী বলল, সু-খবর। আমি এখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করছি।

মিসাউদি বলল, আমাদের দেশ কি করেছে?

এখনও কোন খবর নেই। মনে করা যেতে পারে, এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসেনি।

ডাক্তার জোনাস জানতে চাইল, আমার দেশ কি করছে?

তোমার দেশেরও কোন খবর নেই।

ডাক্তার জোনাস বলল, আফরিকার সব রাষ্ট্রই চিন্তা করছে অ্যাঙ্গোলার বিষয়। জামবিয়ার প্রেসিডেণ্ট কুন্দা ভাবছে অ্যাঙ্গোলাকে স্বীকৃতি দেবে কি না। জামবিয়ার বিদেশ-মন্ত্রী বান্দু তো প্রকাশ্যেই এই ঘোষণা করে জানিয়েছে, তার দেশ চিন্তা করছে স্বীকৃতি দেবার বিষয়।

তা হলে তো FNLA এবং UNITA ঘোরতর বিপদে পড়বে। তারা শেষ পর্যন্ত জামবিয়াতে এবং জাইরেতে ঘাঁটি করে গেরিলা যুদ্ধ চালাবার যে মতলব করেছে তা ভেস্তে যাবে।

মিসাউদি হেসে বলল, স্বীকৃতি দিলেই যে শত্রু পক্ষকে সাহায্য করবে না একথা 'কোন রাজনীতির কেতাবে নেই বন্ধু। রাজনীতি হল প্রয়োজন। প্রয়োজনে শত্রুও মিত্র হয় আবার মিত্রকেও পরিত্যাগ করা যায়।

অযৌক্তিক নয় তোমার বক্তব্য। পর্তুগাল এতকাল অ্যাঙ্গোলাকে শোষণ করেছে, যে পর্তুগীজদের অত্যাচারে আফরিকার মানুষ জর্জরিত, আজ রাজনীতির প্রয়োজন মেটাতে অ্যাঙ্গোলার সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র স্বীকার করেনি উপরন্তু MPLA-এ সরকারকে আইন-সম্মত অ্যাঙ্গোলার সরকার বলে স্বীকার করেছে। পর্তুগাল NATO-র সদস্য। পশ্চিমী শক্তির সাহায্যেই তার উপনিবেশ গুলো এতকাল রক্ষা করে এসেছে, আজ সেই পর্তুগাল NATO সম্বন্ধে উদাসীন। এ সব কিছু ঘটছে রাজনীতির প্রয়োজনে।

ঠিক বলেছ মীরচান্দানী। বর্তমানে পৃথিবীর বহু ছোট বড় শক্তি MPLA-কে স্বীকার করেছে, অনেক দেশ সুযোগের অপেক্ষা করছে। সুযোগ পেলেই তারা অ্যাঙ্গোলার ন্যায়সম্মত সরকাররূপে MPLA-কে গ্রহণ করবে। যারা করতে রাজি নয় তাদের যুক্তি আরও অদ্ভুত। আফরিকার কতকগুলো দেশ, বিশেষ করে কালো মানুষের দেশ কেন যে MPLA-কে স্বীকার করতে চাইছে না তা যদি বিশ্লেষণ করা যায় দেখতে পাবে তাদের যুক্তি মোটেই সবল নয়।

আফরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলো গত দশই জানুয়ারী সমবেত হয়েছিল আদিস আবাবায়। এই শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে। অ্যাঙ্গোলায় শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানে সবাই আগ্রহী অথচ সবাই একমত নয়। অথচ আফরিকার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করার সাথে সাথে আফরিকার বিভিন্ন উপনিবেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তেষট্টি সালের মে মাসে আফরিকার মুক্তিকামী মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "OAU" (Organisation for African Unity) গড়ে উঠে। এই সংগঠন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে তীক্ষ্ণ করে তোলে এবং দ্রুত আফরিকার সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে কালক্রমে OAU আফরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের এক সুসংহত ও শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়।

ডাক্তার জোনাস বলল, তুমি ঠিকই বলেছ অথচ অ্যাঙ্গোলার প্রশ্নে এই মহান প্রতিষ্ঠান OAU-তে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে নেহাত কয়েকজন নেতার ব্যক্তিগত কারণে এবং উগ্র রুশ বিরোধী মনোভাবে। এই ভাবে OAU দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে যে পরিণত হতে পারে এটা অনেকে ভাবতেও পারে নি। এই ব্যর্থতার কারণ হল সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার অনুগামী আফরিকান রাষ্ট্র সমূহ।

মীরচান্দানী বলল, ঠিকই বলেছ ডাক্তার। এই তো গত একুশে জানুয়ারী টিউনিসে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে টিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি হাবিব বরগুইবা সোভিয়েত রাশিয়াকে আফরিকার মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের পথে প্রধান বাধা হিসাবে বর্ণনা করেছে। OAU-তে যে ভাঙ্গন তা এই বর্ণনা থেকে বেশ স্পষ্ট।

ডাক্তার জোনাস বলল, আরও ঘটনা ঘটেছে বন্ধু। গণ প্রজাতন্ত্রী মালির পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে মালির প্রেসিডেণ্ট অনুরূপ মত ব্যক্ত করে বলেছে, আজ যদি আফরিকার মাটিতে মুক্তিসংগ্রামগুলো বিলম্বিত ও ব্যর্থ হয় তার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী হবে সোভিয়েত রাশিয়া। কারণ তার ভ্রান্ত নীতির জন্যই আফরিকায় প্রতিক্রিয়ার হাত আজ শক্ত হচ্ছে।

ঠিক উল্টোটা বলছে ইদি আমিন এবং ইথোপিয়া। তারা মনে করছে সোভিয়েত সহায়তা ভিন্ন আফরিকা থেকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা সম্ভব নয়

এই মতান্তরের ফলে যারা সোভিয়েত ও MPLA বিরোধী তারা অবিলম্বে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে কোয়ালিশন সরকার গঠনের এবং বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী তুলেছে। সেই জন্য তারা অ্যাঙ্গোলার বিবদমান কোন পক্ষকেই স্বীকৃতি দেয় নি।

মীরচান্দানী বলল, আমাদের দেশ MPLA-কে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তারা ন্যায্য কাজ করেছে। স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেওয়াই রাজনীতির ধর্ম।

ডাক্তার জোনাস বলল, আমার মনে হয় এই লড়াইটা ছিল অনাবশ্যক। এই লড়াইয়ের দরুণ আফরিকার সংহতিতে যে ফাটল ধরেছে তা সহজে জোড়া লাগার সম্ভাবনা কম। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এটাই আমার আশঙ্কা। যে রাশিয়া আজ মনে করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব, সেই রাশিয়া অ্যাঙ্গোলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এইভাবে রক্তপাত ঘটাতে সাহায্য না করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করলেও তো পারত। তাদের কথা ও কাজ এক পথে চালাবার দায়িত্ব নেই, এটাই মনে হয়।

মিসাউদি হেসে বলল, রাশিয়া তার নীতি বদল করেছে মনে হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যারা স্বপ্ন দেখে তারা ঠিক সেই দলের যারা মনে করে ভোটের বাক্স দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তাই যদি সম্ভব হত তা হলে চিলিতে এলেন্দির অপঘাত মৃত্যু ঘটত না। বোধহয় শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই মালাহাসিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে হয়েছে। এই নীতি ও কার্য পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সেজন্য ও সব বড় বড় কথায় আস্থা রাখা যায় না।

ডাক্তার জোনাস বলল, পুরানো কথা মনে করিয়ে দিলে মিসাউদি। সেটা হল বাহাত্তর সাল। আমরা তখন কোস্টাল সার্ভিস দিচ্ছি ডাকার থেকে মোম্বাসা। আমাদের রেডিও অফিসার ছিল আউ সান। ভদ্রলোক ফিলিপাইনের লোক। বড়ই অমায়িক ও মিশুক। আমাদের রোজারিও যেমন জমিতে পা দিলেই নিষিদ্ধ পল্লীর সন্ধানে বের হয়, আউ সান তেমন ছিল না। বড়ই সৎ ও ভদ্র ছিল সে।

ডাক্তার কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে থাকে, মে মাস। আমি তখন নীচের ডেকে। এমন সময় আউ সান দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, আরেকটা সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বন্ধু ?

মালাগাসিতে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ মালাগাসি। প্রশাসন কায়েম হয়েছিল কিছুকাল আগে। দেশের সংবিধান রচনার পর বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়েছিল। সামরিক গ্রুপের মাধ্যমে নির্বাচিত এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেছিল দিদিয়ার রাটসিরিকা। ক্ষমতা দখল করেই পূর্বের গণতান্ত্রিক সংবিধান বাতিল করেছিল দিদিয়ায় রাটসিরিকা। বাতিল করার কারণ, সংবিধান প্রণেতারা ছিল মার্কিন তাঁবেদার। গণতন্ত্রের নামে পুঁজিতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে এই সংবিধান রচিত হয়েছিল। সেই দিদিয়ার রাটসিরিকা নতুন সংবিধান উপহার দিয়েছে দেশকে।

বললাম, ভালই হয়েছে।

তারপর সেই দিদিয়ায় রাটসিরিকা ঘোষণা করল, আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এই সংবিধান রচনা করেছি। আমাদের বৈদেশিক নীতি হবে রাশিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

মীরচান্দানী বলল, সর্বত্র-ই রাশিয়া। রাশিয়ার নীতির জয়জয়কার।

এবার মালাগাসি অ্যাঙ্গোলার MPLA সরকারকে স্বীকৃতি দেবে নিশ্চয়ই।

সেটাই আশা করা যায়।

ডাক্তার জোনাস বলল, মালাগাসির জঙ্গী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি রাটসিরিকা ঘোষণা করেছে MPLA-কে সহযোগিতা করার জন্য মালাগাসি তার সৈন্যবাহিনীকে অ্যাঙ্গোলাতে প্রেরণা করবে। সোভিয়েত সরকার মালাগাসির এই তাৎপর্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতিতে সমর্থন জানিয়েছে এবং মালাগাসির সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ও বৈদেশিক নীতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে সোভিয়েত সরকার। কিন্তু মালাগাসির সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাতেও ক্ষুব্ধ হয় নি সোভিয়েত রাশিয়া।

তুমি সোভিয়েত সরকারের কাজকে পছন্দ করনা বুঝি?

কেন করব না, নিশ্চয়ই করব। তবে আমার কথা হচ্ছে মেহনতী মানুষ আজ বিপ্লবধর্মী। তারা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে চায় না। কিন্তু তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই যদি স্থির না করে, তাহলে বিদেশীর প্রাধান্য ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। মেহনতী মানুষ নিজেদের সরকার, নিজেদের সংবিধান গড়ে তুলতে পারবে না। চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অলীক স্বপ্ন। গ্রেটব্রিটেনে MPLA সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, আমরা চাই অ্যাঙ্গোলা থেকে ফিরে চলে যাক সমস্ত বিদেশী সৈন্য। অর্থাৎ বিদেশী শক্তির উপাস্থিতি কেউ চায় না। আমার মনে হয় কোন পক্ষই যদি বিদেশীর কুক্ষিগত না হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা স্থির করত তা হলে আজ সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ম পদ্ধতিকে সুনজরে না দেখার কোন কারণ থাকত না। MPLA ক্ষমতালাভ করাতে আমরা খুশী।

আর তো কেউ নেই। FNLA-এর শেষ সমাধি রচিত হয়েছে। রোবের্টোর আর কোন আশা নেই। মোবুতু যতই সাহায্য করুক, জাইরে সীমান্ত অবধি এক ইঞ্চি জমিও রোবের্টোর অধিকারে নেই। সাভিমবি ক্রমেই পিছু হটছে। এবার তাকে সব আশা ত্যাগ করে অন্য কোন দেশে আশ্রয় নেবার জন্য দেশ ছাড়তে হবে।

এরপর দেখবে মোতুবু সরকার FNLA-কে পরিত্যাগ করেছে। তার প্রিয় শ্যালক তখন আশ্রয়ের আশায় দেশে-বিদেশে হন্যে হয়ে ঘুরবে। রাজনীতির এই খেলাটাই হল চরম পরিহাস।

আফরিকার অশান্তি কিন্তু এখানে শেষ হবে না।

সম্ভব নয়। আফরিকাই নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই অশান্তি চরম আকার ধারণ করবে। বিশেষ করে বিপন্ন হবে ছোট ছোট দেশগুলো। বড় বড় দেশের অথবা শক্তিশালী দেশের সন্নিকটে নবলব্ধ স্বাধীন দেশগুলোর ভাগ্য নিয়ে ইতিমধ্যে ছিনিমিনি খেলা

আরম্ভ হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে সবল রাষ্ট্রগুলো দুর্বল ও ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশগুলোকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। স্প্যানিশ সাহারা নিয়ে ইতিমধ্যে লড়াই দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। মরক্কো, আলজিরিয়া ও মারিটেনিয়া মুখ ব্যাদান করেই আছে। তাদের কেউ না কেউ স্প্যানিশ সাহারাকে গ্রাস করতে চায়। হয়ত সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে পারবে না, কিন্তু আংশিকভাবে গ্রাস করার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূর্ব টিমরকে গ্রাস করতে ইন্দোনেশিয়া ফৌজ পাঠিয়েছে।' বেলিজ (বৃটিশ হণ্ডুরাস) স্বাধীনতা লাভ করেছে এই'তো এক মাস আগে। বেলিজে আছে প্রচুর খনিজ তেল। এই তেলের অধিকার নেবার চক্রান্ত চলছিল গুয়েটেমালায়। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ও দুর্বল বেলিজের ওপর গুয়েটেমালা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতকাল বেলিজ ছিল ইংরেজের উপনিবেশ। আজ বেলিজ অসহায়। তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। ইতিমধ্যেই গুয়েটেমালা বেলিজের তৈল সমৃদ্ধ পুপাকিয়ানা দখল করেছে। এইভাবে অশান্তি জিইয়ে রাখা হয়েছে বিশ্বের বহু স্থানে।

তোমার কথাই ঠিক। আমিও এই আশঙ্কা করছি। শান্তি আসবে না। অস্ত্রের মুখেই শান্তির মীমাংসা করতে হবে। শান্তির মুখোসে অশান্তি সৃষ্টি হল বর্তমান রাজনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সেই রাজনীতির শিকার হয়েছে পৃথিবীর অনেকেই। তবে আফরিকার অশান্তি চলতে থাকবে বর্ণ বিদ্বেষের ভিত্তিতে। আফরিকার বুকে যতদিন শ্বেত শাসন রইবে বিশেষ করে রোডেশিয়া আর দক্ষিণ আফরিকায় এবং নামিবিয়াতে, ততদিন আফরিকার শান্তি স্থাপন হতে পারে না। তার লক্ষণ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে।

আরও বেশি করে অশান্তি সৃষ্টির জন্য শ্বেতাঙ্গ শাসিত অঞ্চলের সরকার নানা ফন্দীও বের করেছে। ওরা চায় কৃষ্ণাঙ্গরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যত বেশিদিন জিইয়ে রাখবে তত বেশিদিন ওদের শাসন ও শোষণ কায়েম থাকবে। এখনও অ্যাঙ্গোলায় ওরা

প্রচার চালাচ্ছে। তারজন্য এখনও অনেক পত্র পত্রিকা ছাপিয়ে ছড়ান হচ্ছে, প্রাইভেট রেডিও স্টেশন চালু রেখে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে।

ডাক্তার নেটো কিন্তু বোকা নয়। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে চোখ কান খুলে রাখতে হয়। সেদিকে মোটেই ত্রুটি ঘটছে না। বিরুদ্ধপক্ষ যাতে মিথ্যা প্রচার করতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সে ত্রুটি করেনি। লোবিটো বন্দরে প্রতিদিন তিনবার করে লোবিটো নামে দৈনিক পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকার কাজ ছিল MPLA-এর বিরুদ্ধে প্রচার করা। এই পত্রিকা পরিচালনা করত UNITA, সেজন্য UNITA-র সাফল্য সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে জন সাধারণকে প্রতারিত করত। এমন কি যখন MPLA সৈন্য লোবিটোর বিশ মাইলের মধ্যে এসে গেছে তখনও প্রচার করা হচ্ছিল MPLA-সৈন্যকে দুইশত মাইল পিছু হটে যেতে হয়েছে। লোবিটো বন্দর কয়েকমাস UNITA-র অধীনে থাকায় এই মিথ্যা প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল। MPLA বাহিনী লোবিটো বন্দর দখল করার পরই সবার আগে এই প্রচার যন্ত্রকে মিথ্যা প্রচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

রোজারিও কথার মাঝে যোগ দিয়ে বলল, লণ্ডন থেকে খবর প্রচার করছে বৃটিশ রেডিও। তাদের খবরে প্রকাশ, MPLA সরকার অ্যাঙ্গোলার সকল রেডিও স্টেশনকে নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন নিজস্ব কোন প্রোগ্রাম প্রচার না করে, প্রচার করবে কেবলমাত্র লুয়ান্দা থেকে প্রচারিত প্রোগ্রাম। লুয়ান্দার প্রোগ্রাম রিলে করা বাধ্যতামূলক করেছে। অবশ্য এটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার ব্যবস্থা বন্ধ করতে আমাদের বিপ্লবী বাহিনী সংবাদপত্রের প্রচার ব্যবস্থা নিজেদের আয়ত্বে এনেছে। (reactionary conduct which has been overtaken by the forces of our revolutionary army,) বর্তমান যুগে

প্রচার ব্যবস্থাই হল যুদ্ধের অন্যতম বড় অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগ করে বিরুদ্ধপক্ষ যাতে প্রগতির পথ রুদ্ধ না করে তার জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে MPLA সরকার।

কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলো নীরব কেন?

বেশির ভাগ পশ্চিমী দেশই MPLA সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। গ্রেটবৃটেনের সংবাদ তো শুনেছ। এমন কি স্পেনও স্বীকৃতি জানিয়েছে। স্পেনের বক্তব্য সব চেয়ে সুন্দর। তারা বলছে, সরকার কে অথবা কারা পরিচালনা করছে তা আমরা বিবেচনা করি না, সেটা সেই দেশের অন্তর্দেশীয় ব্যাপার। আমরা স্বাধীন দেশের যে কোন নীতি অবলম্বনকারী সরকারকেই স্বীকৃতি দেই। সেজন্য যেহেতু MPLA প্রায় গোটা অ্যাঙ্গোলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাকেই আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি।

ভবিষ্যতে যদি FNLA এবং UNITA-র সম্মিলিত দল ক্ষমতা পায়?

তাহলে তাকেও তারা স্বীকার করে নেবে। দল উপদলীয় বিষয় নিয়ে তারাই মাথা ঘামায় যাদের স্বার্থ জড়িত থাকে। স্পেনও তার উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতা দান করতে এগিয়ে এসেছে। যুগ ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার নীতি গ্রহণই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু যত অশান্তি দেখা দেবে যে সব দেশ স্বাধীনতা লাভ করেনি তাদের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়। আজ কৃষ্ণাঙ্গদের আর দাসত্বের নিগড়ে আটক রাখা সম্ভব হবেনা।

তবে দেখছি MPLA বিরুদ্ধ পক্ষকে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ দিচ্ছেনা। ঝটিকার মত বেগে এগিয়ে চলেছে। গোটা দেশটা দখলে আনতে আর একমাসও প্রয়োজন হবেনা বলেই মনে হয়।

রোজারিও বলল, লুয়ান্দার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক। আমরাও অ্যাঙ্গোলার সমর্থক। এবার আমরা নিরাপদে বেড়িয়ে বেড়াতে পারি।

কিন্তু বন্ধু, অ্যাঙ্গোলা বড়ই কঠিন ঠাঁই।

জানি। জেনেই যেতে চাইছি। আর হয়ত দু চার দিনের মধ্যেই আমরা ড্রাই ডক থেকে বেরিয়ে পড়ব। অ্যাঙ্গোলাকে আর দেখতে পাব না, ভবিষ্যতে এমন আশঙ্কা আছে। আফরিকার মাটির সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা দিনের। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ করতে চাই।

কি আবোল তাবোল বকছ রোজারিও। আমরা জাহাজী, আমরা আবার আসব। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অ্যাঙ্গোলার স্বাভাবিক জীবন দেখতে পাব। ঘাবড়ে যেওনা বন্ধু।

তোমরা এই জাহাজের খোলে বসেই কটা দিন কাটাতে চাও।

মোটেই না, তবে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে না পারলে কোথাও যাব না। এর আগে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছি। তবে লুয়ান্দায় ঘুরে বেড়াতে আপত্তি নেই। আবার শহর ঝলমল করছে বিদ্যুতের আলোতে, আবার বাজার দোকান-পাট খুলেছে, আবার গাড়ি চলছে শহরের পথে পথে, আবার শোনা যাচ্ছে শিশুদের কলকাকলি, আবার ফিরে আসছে গৃহত্যাগীরা, আবার কাজ চালু হয়েছে অফিসে অফিসে, আবার ভীড় জমেছে হাসপাতালে, আবার শিশুরা পাঠশালায় যাচ্ছে। এই তো সুযোগ। এবার লুয়ান্দাকে দেখে আসব আমরা, নতুন চোখে দেখতে হবে নবজাতকের কর্মকেন্দ্রকে, রাজধানী লুয়ান্দাকে।

আমরা বিদেশী। নবজাতককে ভাল করে দেখতে বেরিয়েছি।

অতি মৃদুস্বরে বলল মিসাউদি। প্রশ্নকর্তা পথচারী অ্যাঙ্গোলার কোন ভদ্রব্যক্তি। পরিধানে ইউরোপীয় পোষাক। পিঠে একটা রাইফেল। বলিষ্ঠদেহ, চওড়া কপাল, কোঁকড়া চুলগুলো উস্কো খুস্কো, বড়ই পরিশ্রান্ত মনে হল তাকে।

আপনি কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছেন?

তাও বলতে পারেন তবে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। যুদ্ধের আনুসঙ্গিক কাজে আমরা ব্যস্ত। যে বয়সের লোক যুদ্ধে যাচ্ছে আমার বয়স তার চেয়ে বেশি। আমাকে ওরা ত্যাগ করেছে। ওরা আমাকে পরিত্যাগ করলেও আমি ওদের পরিত্যাগ করতে পারিনা। আমি গৃহরক্ষী দলে যোগ দিয়েছি। ছোট একটা কোর আমি পরিচালনা করছি। যারা জওয়ান তারা গেছে শত্রু তাড়াতে শূন্যস্থান আমরা যারা প্রৌঢ়-তারাই পূরণ করছি। আপনারা কি দেখতে বেরিয়েছেন ?

তাইতো! কি আর দেখব! আমরা দেখব মুক্ত এলাকার অসামরিক ব্যবস্থা।

ওঃ। তা ভাল। আপনারা এগিয়ে যান রেঙ্গুলার দিকে। দেখে আসুন কৃষ্ণকায়দের অবস্থা।

ও জায়গা আমরা দেখেছি।

দেখেছেন কিন্তু একটা জিনিষ দেখতে বোধহয় ভুল হয়েছে। মানুষ্যত্বকে কি ভাবে গলা টিপে হত্যাকরার অপচেষ্টা করেছে বিদেশী শাসকরা সে চিত্র দেখে আসুন। আগামী কয়েক বছর পর হয়ত ওসব আর দেখতে পাবেন না। মানুষ তো ভুলে যায়। দিন কাটলেই গতদিনকে ভুলবার চেষ্টা করে মানুষ। মানুষ ভুলে যায় বলেই মানুষের মৃত্যু ঘটেনি আজও। যদি অতীতকে কামড়ে পড়ে থাকত, তা হলে মনুষ্যত্ব তো দূরের কথা মানুষের অস্তিত্বই হয়ত থাকত না। আপনাদের কোন অসুবিধা বা বিপদ ঘটলে নিকটবর্তী কোর সেণ্টারের সাহায্য নেবেন। আমরা সাহায্য করতে সদাই উদ্‌গ্রীব।

কেমন গোলমাল হয়ে গেল মীরচান্দানীর। অযাচিতভাবে কোন লোক এইভাবে এগিয়ে আসে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এটা সে ভাবতেও পারেনি। ভদ্রলোক তাদের দেখেই বিদেশী বলে মনে করেছে, সেজন্য সৌজন্য দেখাতে ত্রুটি করেনি।

অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

চলতে চলতে একটা পানশালা দেখতে পেয়ে তিনজনেই ঢুকে পড়ল গলাটা ভিজিয়ে নিতে।

একটা টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। পানীয় দেবার অনুরোধ জানাল।

কি বুঝছ ডাক্তার জোনাস, এরা শেষ পর্যন্ত টিকবে তো?

বন্ধু মিসাউদি কি মনে করে জানিনা তবে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বিষাক্ত অঙ্গচ্ছেদ জীবন রক্ষার অন্যতম ও শেষ পন্থা। এরা বিষাক্ত অঙ্গচ্ছেদ করতে ব্যস্ত। এখনই টিকে থাকার কোন প্রশ্ন উঠতেই পারেনা। বিষাক্ত অঙ্গচ্ছেদ যন্ত্রণাদায়ক হলেও তা করতে হয়। এরাও তাই করছে।

নমস্কার!

মুখ তুলে তাকাল তিনজন।

আপনারা বুঝি সাংবাদিক?

না। আমরা জাহাজী, আমরা জাহাজে চাকরি করি।

ওঃ! তা কোথাকার জাহাজ?

হংকং রেজিষ্টার্ড। অবশ্য হংকং-এর জাহাজ নয়। হংকং-এর সুযোগগুলো আমরা পাই।

ওঃ। তা অ্যাঙ্গোলায় বুঝি মাল নামাচ্ছেন?

না। আমাদের জাহাজ ড্রাই ডকে রয়েছে। মেরামত হচ্ছে সেখানে। আমরা অবসর সময় কাটাতে বের হয়েছি।

ওঃ। আপনাদের খাওয়া শেষ হয়েছে কি?

তা হওয়ার মতই।

দয়া করে একবার আমাদের পুলিশ স্টেশনে চলুন।

কেন?

আমরা যুদ্ধাবস্থায় রয়েছি। বিদেশীদের গতায়াত সম্বন্ধে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আপনাদের কাগজপত্র মানে পাশপোর্ট নিশ্চয়ই সঙ্গে আছে। সেগুলো একবার দেখে নেব আমরা।

আপনাদের কিছুটা অসুবিধা হবে। তার জন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এটা আমাদের কর্তব্য এবং উপরওয়ালার নির্দেশ।

অবশ্য আপনার নির্দেশ মান্য করব। চলুন তাহলে আপনাদের শান্তিকুঞ্জ দেখে আসি।

থানায় এসে অবাক হয়ে গেল তিনজনই। থানাটা যেন একটা দুর্গ বিশেষ। এর কোনায় কোনায় কি আছে কে জানে তবে পর্তুগীজ সরকার দেশ শাসন করতে পুলিশী ব্যবস্থাটা যে শক্ত মজবুত. করেছিল তা থানার চেহারা দেখলেই বুঝা যায়। একটা মাছি বেরিয়ে যাবার পথও যেন রাখেনি।

অনেকক্ষন থানার বারান্দায় একটা বেঞ্চে বসে থাকার পর তাদের ডেকে পাঠাল ভেতরে।

ভেতরে ঢুকতেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, বসুন।

তিনজনেই তাকিয়ে দেখল বিশাল বপু তামাটে রং-এর একজন মধ্য বয়সী ভদ্রলোক বসে রয়েছে। তার টেবিলের সামনে কয়েকখানা চেয়ার।

বসুন। আপনাদের কথা শুনলাম। অবশ্য ধরে আনার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কেবলমাত্র পাশপোর্টগুলো দেখে নিলেই পারত। দেখি আপনাদের পাশপোর্ট।

তিনখানা পাশপোর্ট তীক্ষ্ণভাবে দেখে বলল, ঠিক আছে। আপনাদের কষ্ট দিলাম সেজন্য ক্ষমা করবেন। আমাদের কূটনৈতিক মিশন বাইরের কোন দেশে এখনও স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আপনাদের "প্রবেশ" অনুমতি নিতে হবে ইমিগ্রেশন অফিস থেকে। আপনারা ইমিগ্রেশন অফিস থেকে অনুমতিটা নিতে ভুলবেন না। আর এই শহরের বাইরে যেতে হলে আমাদের এখানে খবর দেবেন। আপনাদের জীবনের কোনরূপ দায়িত্ব আমরা নিতে অক্ষম। যেখানেই যাবেন নিজেদের দায়িত্বে যাবেন। অন্যথা আমাদের দোষারোপ করবেন না।

তিনজনে উঠে দাঁড়াতেই অফিসার বললেন, বসুন। একটু কোকোর ব্যবস্থা করেছি।

প্রয়োজন ছিল না কোতোয়াল সাহেব।

হেসে অফিসার বললেন, খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন দেখছি। আমাদের কি অপরাধ বলুন। তবে আপনারা যদি কোন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের লোক হতেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের ওপর কড়া নজর রাখতেই হত। আপনারা এশীয় এবং আফরিকার লোক সেজন্য আপনাদের গতিবিধির ওপর বিশেষ কোন নজর রাখতে হবে না বলেই বিশ্বাস করি। এই যে কোকো এসে গেছে। গরম গরম এক কাপ কোকো খেয়ে নিন। শরীরটা চাঙ্গা হবে, ঘুরে বেড়াতে আরও উৎসাহ পাবেন।

নিঃশব্দে কোকোর পাত্র শেষ করে তিনজনেই উঠে দাঁড়াল।

এবার ফিরে যাবার জন্য অনুমতি দিন। শুভেচ্ছা নিন।

আরও একটু বসুন। আমার গাড়ি আসছে। আপনাদের নিয়েই বের হতে পারব।

আমাদের অসুবিধা আছে। পায়ে হেঁটে শহর দেখার আনন্দ নষ্ট হবে। আমাদের সময়ও খুব সীমাবদ্ধ। যতটা যাব মনে করেছি অতটা যাবার সময়ই পাব না। জাহাজে ফিরতে হবে সময় মত।

আপনাদের অসুবিধা থাকলে আমি পীড়াপীড়ি করব না। লুয়ান্দা দেখবার মত শহর নয়। আপনারা নানা দেশ ঘুরে এর চেয়ে অনেক অনেক ভাল শহর দেখেছেন, তার তুলনায় লুয়ান্দা কিছুই নয়। 'রাজধানী লুয়ান্দার অধিবাসীর আশী ভাগ ছিল পর্তুগীজ। তাদের অধিকাংশই এ দেশ ছেড়ে গেছে। তাই কোথাও কোথাও মনে হবে জনমানবশূন্য। এরা যুদ্ধের আতঙ্কে পালায় নি, এরা সত্যি সত্যিই এ-দেশ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেছে। আর কৃষ্ণাঙ্গদের এলাকা আগের চেয়েও বেশি জমজমাট।

আপনারা কি বিদেশীদের নিয়ে বিপন্ন হয়েছেন কখনও?

হয়েছি বলেই এত বেশী সতর্কতা। পথে ঘাটে সৌজন্যের অভাব হবে না কিন্তু পরাধীন জাতির যে মানসিকতা সেটা তো বাদ দেওয়া যায় না। বিদেশীকে অবিশ্বাস করাই হল কালো মানুষদের বিশেষত্ব। সেই কারণে এবং শ্বেতকায় ভাড়াটিয়া সৈন্যের চলাচলে আমরা ঠিক করে নিতে পারি না কে শত্রু আর কে মিত্র। যাচাই করে নিতে হচ্ছে সেই কারণে। আচ্ছা নমস্কার। কোন অসুবিধা হলে এখানে খবর দেবেন।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে।

শহরের নেটিভ পল্লীর পাশেই পর্তুগীজ মূলধনে পরিচালিত মাঝারি ধরণের কাপড়ের কল। কাপড়ের কলের শ্রমিক বস্তি দিয়ে তারা দ্রুত এগিয়ে চলেছিল বন্দরের দিকে। এই এলাকা পার হয়েই সোজা রাস্তা গেছে বন্দরে। পথের দু পাশে আছে শ্রমিক বস্তি।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল তিনজনই।

আওয়াজ শুনে তিনজনই বুঝতে পারল, পাশের কয়েকখানা সাজানো গৃহের অধিবাসীরা বোধহয় সারাদিনের ক্লান্তি বিমোচন ঘটাচ্ছে উগ্র মদ্য পান করে।

মিসাউদির বুকটা যেন ব্যথায় ভরে উঠল। একই চেহারা সে দেখেছে পৃথিবীর বহুস্থানে। শ্রমিক জীবনটা কতটা ক্লেদময় তাও সে জানে। যে মানসিকতা শ্রমিক জীবনকে পবিত্র করে সে মানসিকতা সৃষ্টির কোন সুযোগই পায় না এই সব শ্রমিক। এরা কাজ করে আনন্দ পায় না। তাই বাহির থেকে আনন্দ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। আর সেই আনন্দ সংগ্রহ করতে মদ্যপান যেন অপরিহার্য। শ্রমিক জীবনের পাপ যেমন অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রকট, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটছে না।

মিসাউদি বলল, এই হল পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিকতার নিষ্ঠুর পরিচয়।

মীরচান্দানী ঘুরে দাঁড়াল।

আর অপেক্ষা করা নয় বন্ধু। এদের আচরণ মোটেই রুচি সম্মত নয় বলেই মনে করি। এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। চারিদিকে চলছে রক্তের খেলা আর এরা তারই মাঝে মদ্যপান করে আত্মহারা হয়েছে। এদের বিশ্বাস নেই।

ডাক্তার জোনাস বলল, পরাধীন দেশে, পুঁজিবাদী দেশে যা সমাজকে নীচে নামায় তাহল দুর্নীতি। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা পরদেশকে শোষণ করে, শোষণের পথ উন্মুক্ত রাখতে তারা যেমন এদের মনে দাসত্ববোধ জন্ম দেয় তেমনি নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। এই অধঃপতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মত পরিবেশ কোন সময়ই সৃষ্টি হতে দেয় না। এখানেও তা ঘটেছে।

মীরচান্দানী নিম্নস্বরে বলল, অপশাসন ও শোষণ কায়েম করতে হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রয়োজন বুদ্ধিজীবিদের মগজ ধোলাই। মদ ও নারীর সমন্বয় ঘটিয়ে তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে না পারলে ওদের সমূহ ক্ষতি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পূজার প্রাধান্য সৃষ্টি করতে হয়, ধর্মের নামে কুসংস্কার ও অনাচারকে ব্যাপক করে তুলতে হয়।

সেই কাজই করেছে পর্তুগীজ শাসকরা বিগত পাঁচশত বৎসর যাবত। তারই ফল ভোগ করছে এরা।

দাঁড়াও।

গম্ভীর গলায় কে যেন আদেশ করল। গলার শব্দে তিনজনই চমকে উঠল।

সতর্ক হল তিনজনেই।

সন্ধ্যার পর পথঘাটের যুদ্ধ বিধ্বস্ত কোন দেশের কোন অংশই যে নিরাপদ নয় এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ-ই ছিল না! তিনজন বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে।

বন্দরে।

পকেটে কি আছে?

যাই থাকুক তোমার কি প্রয়োজন।

প্রয়োজন। দাঁতে দাঁতে চেপে বলল আগন্তুক। পকেট থেকে পিস্তল বের করে বলল, কি আছে তোমাদের পকেটে? বের কর নইলে তোমাদের লাশ পড়বে মাটিতে।

মীরচান্দানী এগিয়ে গেল।

বলল, তুমিই সার্চ করে দেখ।

আগন্তুক বাঁ হাতে পিস্তল নিয়ে মীরচান্দানীর পকেটে হাত ঢোকাল।

তারপর যা ঘটল তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শোনা গেল একটা আর্তনাদ। মিসাউদি হঠাৎ লাফিয়ে আগন্তুকের বাঁ হাত এমন কায়দায় চেপে ধরল যার ফলে পিস্তল হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে মীরচান্দানী আগন্তুককে জাপটে ধরল মাটির সঙ্গে। ডাক্তার জোনাস পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, চুপ করে শুয়ে থাক নইলে তোমার লাশ পড়ে থাকবে মাটিতে।

উঃ ছেড়ে দাও।

এই তোমার বীরত্ব এই শক্তি নিয়ে পথচারীকে আক্রমণ করে থাক! বাহবা! উঠে দাঁড়াও। চল আমাদের সঙ্গে। উঁহু, সামনে চল। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব।

ডাক্তার জোনাসের নির্দেশমত আগে আগে চলতে থাকে আগন্তুক।

শ্রমিক পল্লী ছেড়ে বাহিরের খোলা রাস্তায় পৌঁছেই ডাক্তার জোনাস বলল, আমরা বিদেশী। আমরা মানুষ মারতে এদেশে আসিনি। তুমি এবার ফিরে যাও। পুলিশের হাতে তুলে দিতেও চাই না। তবে পিস্তলটা তুমি আর পাচ্ছ না। ওটা আমাদের সহচর হয়েই নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে, বুঝলে।

মাথা নেড়ে আগন্তুক দাঁড়িয়ে রইল।

আকাশ পরিষ্কার। জ্যোৎস্নাতে চারিদিক আলোয় আলোময়। সেই আলোতে তিনজন খুব ভাল করে আগন্তুকের মুখখানা দেখে নিল।

যাও। শীগগীর ফিরে যাও, নইলে তোমার মৃত্যু অবধার্য।

আগন্তুক প্রথমে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। তারপরই প্রাণপণে দৌড় দিল।

পিস্তলটা দোলাতে দোলাতে ডাক্তার জোনাস হো-হো করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন ডাক্তার?

ভাবছি ওই হতভাগাটার কথা। এমন বিপদে কখনও পড়তে হবে এমন চিন্তা ওর মনে কোনদিনই স্থান পায়নি। অথচ সেটাই ঘটল। ক্রিমিন্যাল, তাই বিশ্বাস করতে পাবে নি। পিস্তলের রেনজের বাইরে যাবার জন্য প্রাণপণ দৌড় দিয়েছে। আর দেরী নয়, যত তাড়াতাড় সম্ভব এগিয়ে চল। আবার কোন বিপদ আসে তার ঠিক নেই।

জাহাজে ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার আগেই তেং পিং এসে অভিবাদন জানাল।

তেং পিং জাহাজের মেট। জাহাজীরা সবাই তাকে খুব ভালবাসে। হংকং-এর পুরাতন বাসিন্দা। কয়েক পুরুষ আগে তেং-এর পূর্ব পুরুষ মূল চীন ভূখণ্ড ছেড়ে এসে ইংরেজের আশ্রয়ে বাস করতে থাকে। সেই থেকেই তারা হংকং-এর স্থায়ী বাসিন্দা। জাহাজের শ্রকিকদের সে নেতা। বয়স বোঝা যায় না। দেহের গঠন বলিষ্ঠ। বহু বৎসর সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। তাকে সবাই ভালবাসে ও সম্মান করে। অফিসাররাও তাকে কখনও নিম্নস্তরের কর্মচারী বলে মনে করে না।

তেং কেবিনে ঢুকতেই সবাই উৎসুকভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি খুব চিন্তায় ছিলাম সাহেব, বলেই তেং সবার মুখ ভাল করে দেখে নিল।

কিসের চিন্তা তেং ?

আপনারা বাইরে ছিলেন। বন্দরের বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে দেরী দেখে চিন্তিত হয়েছিলাম। যাক্ সবাই তা হলে ফিরে এসেছেন।

কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি ?

সামান্য ঘটনা। প্রায় সন্ধ্যাবেলায় আমি আর কারপেনটার জেটির ধারে বেড়াচ্ছিলাম।

ভালই তো। বিকেলে বেড়ানো খারাপ নয়।

ঠাট্টা করছ সাহেব। বেড়াতে না গেলে নিজের চোখে দেখতে পেতাম না। না দেখলে তোমাদের জন্য চিন্তাও করতাম না। ভাগ্যি গিয়েছিলাম।

কি হয়েছিল তাই বল তেং। কি দেখলে, কি ভাবলে, এই সবই বল।

দু'টা খুন চোখের সামনে।

তুমি কি করছিলে ? বাধা দিতে পারলে না, ধরতে পারলে না আততায়ীকে।

সেটাই তো বলছি উত্তর দিকের যে রাস্তাটা গ্যারেজের পাশ দিয়ে গেছে, সেই রাস্তার ধারে বড় বড় কয়েকটা পীচের ড্রাম পড়ে আছে নিশ্চয়ই দেখেছেন।

অত লক্ষ্য করিনি।

আমিও লক্ষ্য করি নি, আজই লক্ষ্য করতে হয়েছে। সেই ড্রামের পেছনে লুকিয়ে ছিল ক'জন গুণ্ডা। আমাদের সামনে প্রায় একশ মিটার দূরে ছিল একজন ভদ্রলোক। লোকটা ফিরিঙ্গি। সাজ পোষাকে বেশ অর্থবান পরিবারের লোক মনে হয়েছে। হঠাৎ ক'জন গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভদ্রলোকের ওপর। তারপর ধস্তাধস্তি-

চীৎকার। চীৎকার শুনে আমরা ছুটে যাচ্ছিলাম সে দিকে। যাবার আগেই দেখলাম ভদ্রলোক মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। ছটফট্ করছেন, সাহায্যের জন্য তারস্বরে চিৎকার করছেন। আমরা ছুটে যাচ্ছিলাম। বন্দুকের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল গুণ্ডারাই বন্দুক ছুড়েছে। ভাবনার অবসর ছিল না, দেখলাম গুণ্ডাদের একজন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আরও কটা গুলির শব্দ শুনলাম। গুণ্ডারা তখন দিয়েছে ভোঁ দৌড়।

কে গুলি করল?

সেটাও ঠিক জানতে পারি নি। পরে জানলাম। পুলিশ আর গৃহবাসীরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির। আমরা যেমন দূরে ছিলাম তেমনি থাকতে হল। শুনলাম, গুণ্ডারা ভদ্রলোককে ছুরি মেরে হত্যা করেছে। ভদ্রলোকের চিৎকার শুনে উল্টো দিকের বাড়ির বাসিন্দারা বেশ উত্তেজিত হয়েছিল। সেই বাড়ির তেতালার কোন বাসিন্দা ঘটনাটা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক বের করে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করেছেন। এই সব দেখে আর বেড়াবার ইচ্ছা হল না। ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম তোমরা তখনও ফিরে আসনি। তাই চিন্তায় মরছিলাম।

মিসাউদ্দি বলল, আমরাও আজ গুণ্ডার হাতে পড়েছিলাম।

সব ঘটনা বলতেই তেং চোখ বড় বড় করে বলল, আপনারা এক সঙ্গে তিনজন ছিলেন নইলে কি যে হত তা বলা যায় না। আর বেড়িয়ে কাজ নেই। ঘরের ছেলে ঘরেই থাকুন।

মিসাউদ্দি হেসে বলল, আমরা জাহাজী। জাহাজীরা জলদস্যু ছিল কিছুকাল আগেও। আমরা যদি দু'চারটে গুণ্ডার ভয়ে জাহাজের খোলে বসে থাকি তার চেয়ে লজ্জার আর কি আছে।

ডাক্তার জোনাস বলল, এগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যে কোন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবেই। তবুও এখানে অত কিছু ঘটছে না। আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রায়ই যেতাম সায়গনে। আমাদের জাহাজ মার্কিন ফৌজের রসদ বহন

করার জন্য ভাড়া দিয়েছিল কোম্পানী। যতদিন মাল নামানো হত ততদিন আমাদের বন্দর এলাকায় থাকতে হত। প্রতিরাতেই শুনতে পেতাম করুণ আর্তনাদ। নারী পুরুষের সম্মিলিত আর্তনাদও শুনতে পেতাম মাঝে মাঝে। আমরা রাতের বেলায় জাহাজ থেকে মোটেই নামতাম না। পরে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। তখন নেহাৎ প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে আর যথাযথ প্রহরায় ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলাতেও জাহাজ থেকে নামতাম না। সে সব বিভৎস ঘটনার তুলনায় এতো অতি সামান্য ঘটনা। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অকারণে বহু ব্যক্তি প্রাণ হারায়। এটাও সেই রকম, এবং সামান্য ঘটনা।

তেং-ও বহুবার সায়গন বন্দরে গেছে। তারও অভিজ্ঞতা কম নয়। তবুও ডাক্তার জোনাসের কাছে আরও কিছু শোনার আশায় বলল, ঠিকই বলেছেন ডাক্তার সাহেব। বহুবার আমিও সায়গন বন্দরে বিপন্ন হয়েছি। কোন রকমে প্রাণটা বেঁচেছে। এখানে যেমন ফিরিঙ্গি আর বিদেশীদের ওপর হামলা হচ্ছে, সেখানে কোন জাত-বিচার ছিল না। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, মঙ্গোলীয় সবাই গুণ্ডাদের শিকার হয়েছে। আইন ছিল সামরিক কর্তাদের হাতে, অসামরিক লোকদের নিরাপত্তার বিষয় তারা চিন্তা করার অবসর পেত না।

ঠিক বলেছ তেং। নদীতে রোজই দেখতাম লাশ ভেসে যাচ্ছে। আমাদের জাহাজের গায়ে রোজই দু'একটা লাশ ভেসে এসে আটকে থাকত। তাদের চেহারা দেখে মনে হয়েছে সায়গনে কেউ-ই নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝেই চমকে উঠতাম, রাতের ঘুম ভেঙ্গে যেত। সারা রাত স্বপ্ন দেখতাম। বর্বরতা কত ভয়ঙ্কর তা জানতে শিখেছি সায়গন নদীতে। নারী ধর্ষণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এরজন্য কোন বিকার ছিল না জনসাধারণের মধ্যে। ধর্ষিতা নারীদের হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিয়ে পাপীরা হাসিমুখে ফিরে যেত। পুলিশ প্রশাসন নামক ব্যবস্থা ছিল যেন অজ্ঞাত। এত খুন-জখম-রাহাজানি-ধর্ষণ অথচ পুলিশ নির্বিকার। কোনদিন পুলিশকে তদন্তেও আসতে দেখিনি। এসব বিচার করলে লুয়ান্দাকে স্বর্গ বলা যায়।

নয়

The capture of Serpa Pinto now renamed Menongue, gives MPLA control of all urban centres.

কনসটান্সকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল মারিয়া।

চোখ ডলতে ডলতে কনসটান্স জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে মারিয়া।

ট্রেন লুয়ান্দা পৌঁছে গেছে। এবার নামতে হবে। সকাল হতে আর দেরী নেই। উঠে প্রস্তুত হও।

আর বিলম্ব নয়। সঙ্গে যা সামান্য কিছু ছিল তা গুছিয়ে নিয়ে দু'জনেই প্রস্তুত হল ট্রেন থেকে নামার জন্য। গাড়ির দরজা খুলতেই দেখতে পেল প্রায় জনহীন প্ল্যাটফরমে কিসের যেন আমেজ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারল না দুজনের একজনও। স্টেশনটাও বিশেষ আলোকিত নয়। অন্ধকার রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিন। দূরের কোন বস্তুই চোখে পড়ছে না। যেখানে সামান্য আলো জ্বলছে সেই স্থানটুকু কেবলমাত্র চোখে পড়ছে।

গত দিনে একটিমাত্র গাড়ি এসেছে লুয়ান্দায়। স্বাভাবিক অবস্থায় একখানা গাড়ি যে সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়, অস্বাভাবিক জরুরী অবস্থায় সেই গাড়ি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ের কমপক্ষেও চারদিন পরে পৌঁছচ্ছে। এমন একটি গাড়িতেই তারা এসেছে। পথশ্রম আহার্যের অপ্রতুলতায় তাদের নড়বার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কোন রকমে শহরে পৌঁছে কোথাও যদি কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারত, রুচিমত পেটভর্তি খেতে পেত তাহলে তারা ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচতে পারত।

বাইরে যারা উৎফুল্ল, যাদের চোখে মুখে আনন্দের আমেজ তাদের দিকে নজর দেবার অবসর তাদের ছিল না। কোনরকমে দেহটাকে টেনে নিয়ে তারা স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে কোন গাড়ি নেই। শহরে যাবার যানবাহন না পেয়ে তারা বসে রইল প্ল্যাটফরমের সিঁড়িতে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে কনসটান্সের চোখ জড়িয়ে আসছিল। মারিয়া সিঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দু চারজন যাত্রী যাতায়াত করছিল। তাদের কথাবার্তার টুকরো-টুকরো অংশ ভেসে আসছিল তার কানে।

কে যেন বলল, সেরপা পিন্টো খতম।

উৎকর্ণ হল কনসটান্স। কদিন আগে সেরপা পিন্টোতে তারা বাস করে এসেছে। সেরপা পিন্টো নামটা শুনেই সে আরও কিছু শোনার আশায় কান পেতে রইল।

সেরপা পিন্টো গেছে, বাস্ শেষ। সাভিমবি শেষ।

আর আমাদের দখল করার কিছু রইল না।

জঙ্গলে যে সব রেগুলার ও গেরিলা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের খুঁজে বের করাই এখন কাজ।

ওরা দুষ্ট ব্রণ।

জীবনহানি ঘটায় দুষ্ট ব্রণ। অচিরেই নিরাময় ঘটাতে না পারলে ভবিষ্যতে দুঃখ পেতে হবে।

সেরপা পিন্টো ছিল অ্যাঙ্গোলার শেষ শক্ত ঘাঁটি। পশ্চিমী শক্তির সাহায্যপ্রাপ্ত MPLA বিরোধীর শেষ শক্ত ঘাঁটি। অবশেষে এর পতন ঘটেছে।

খবরটা সকালের বেতারে ঘোষণা করলেই আনন্দ উৎসব হবে।

কনসটান্স ওদের কথাগুলো শুনছিল। স্থানটা জনশূন্য হতেই মারিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুলে বলল, খবর শুনেছ?

বিস্মিতভাবে কনসটান্সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মারিয়া। চোখে তার প্রশ্ন।

এইমাত্র কজন লোক বলতে বলতে যাচ্ছিল, সেরপা পিণ্টো শহরের পতন হয়েছে।

মারিয়া শুধু বলল, আশ্চর্য নয়।

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল দুজনেই। কয়েকজন লোক দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। তাদের এগিয়ে আসতে দেখে আলোচনা বন্ধ করে চুপ করে রইল দুজনেই। আগন্তুকরা দূরে চলে যেতেই কনসটান্স বলল, UNITA-র পা রাখার স্থানও রইল না।

আপশোষ করছ?

না, আপশোষ নয়! আমি চাইনি রোবের্টো অথবা সাভিমবি এইভাবে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিক। কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল বলেই আজ এই অবস্থা। ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে পারিনি এইটা যা দুঃখ। আর দেরী করে লাভ নেই। চল দেখি যদি কোন যান-বাহন পাই। একটা হোটেলে আশ্রয় নিতে হবে।

জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে মারিয়া কনসটান্সের পেছনে পেছন চলতে থাকে।

রোদ উঠতেই শহর চঞ্চল হয়ে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের কেন্দ্রস্থলে এসে হোটেলের সন্ধান পেল। এই হোটেলে অনেকবার থাকতে হয়েছে কনসটান্সকে। ইতিপূর্বে ডাক্তার নেটোর সঙ্গে দেখা করতে এই হোটেলে বাস করেছে। সে সময় হোটেলের যে চেহারা ছিল আজ যেন সে চেহারা নেই। পূর্বে উর্দি পরা যে সব ওয়েটার ছিল তারা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। যে কাউণ্টারে বসে অভ্যর্থনাকারী মহিলা মিষ্টি হেসে নির্দিষ্ট বাসযোগ্য কামরার নির্দেশ দিত সেখানে বসে আছে একজন বিরাটকায় ব্যক্তি। চুরুট টানতে টানতে আগন্তুকদের নাম লেখার খাতাটি এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার নাম ঠিকানা লিখে দিন। চারতলার তের নম্বর।

একজন বয় এসে জিনিসপত্র ঘাড়ে তুলে নিতেই কনসটান্স অভ্যর্থনাকারীকে বলল, এখানে একস্‌চেনজ্‌ ব্যবস্থা আছে তো ?

স্টারলিং আর পেসো একস্‌চেনজ্‌ চলবে।

ডলার ?

সে তো দুর্লভ বস্তু। থাকলে দিতে পার। কোন চিন্তা করতে হবে না। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।

কনসটান্স মারিয়াকে নিয়ে লিফটে উঠল। বয়ের পেছন পেছন তের নম্বর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কনসটান্স বলল, ডাক্তার নেটোর সঙ্গে যে কোন উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে।

এখন বিশ্রাম। বিকেল বেলায় ফোন করে ব্যবস্থা করলেই চলবে !

কনসটান্স ও মারিয়া সন্ধ্যায় সময় ফোনে বহুবার চেষ্টা করেও ডাক্তার নেটোর সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ করতে পারল না।

মারিয়া বলল, আর চেষ্টা করে কাজ নেই। বরং একটা চিঠি পাঠাও। আজ অথবা কাল চিঠি তার হাতে পৌছবেই। তারপর জানা যাবে ডাক্তার নেটোর উদ্দেশ্য, মানে আমাদের প্রতি তার কিরূপ মনোভাব তা জানা যাবে। আমার বিশ্বাস এটাই সহজ পথ।

তোমার কথা মত চিঠি নিশ্চয়ই দেব তবুও ফোন করে আবার যোগাযোগ করতে চেষ্টা করব।

পরদিন সকালে চিঠি পাঠিয়ে কনসটান্স আবার ফোন নিয়ে বসল। কিন্তু কোনমতেই ডাক্তার নেটোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। ইতিপূর্বে নেটোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি। এখন ডাক্তার নেটো বোধহয় পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি ব্যস্ত মানুষ। একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মদাতা যে ব্যস্ত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক।

কনসটান্স ও মারিয়া আরও দুদিন অপেক্ষা করার পর সত্যিই একদিন ডাক্তার নেটোর প্রেরিত লোক এসে উপস্থিত হল।

আমাদের মহামান্য প্রেসিডেণ্ট আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন এই চিঠি দিয়ে।

চিঠি দিয়েছেন ডাক্তার নেটো।

আমি অনুগৃহীত হলাম। আপনি বসুন।

কনসটান্স চিঠি খুলে পড়লেন। সামান্য দুটো ছত্র। সময় দেওয়া হয়েছে কখন ডাক্তার নেটোর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব।

চিঠি পড়া শেষ করে পত্রবাহককে বিদায় দিল।

মারিয়া বাজারে বের হয়েছিল। ফিরে এসে দেখল কনসটান্স ডাক্তার নেটোর চিঠি হাতে করে গম্ভীরভাবে বসে রয়েছে।

কার চিঠি?

ডাক্তার নেটোর।

কখন এল?

এই মাত্র দিয়ে গেল বিশেষ পত্রবাহক।

কি লিখেছে?

সময় দিয়েছে দেখা করার। মাত্র পাঁচমিনিট সময়।

তার মত লোক যে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে এটাইতো যথেষ্ট। আরেকটা খবর শুনে এলাম! লোকের মুখে মুখে খবর ঘুরছে।

কি খবর?

জাইরে MPLA-এ সরকারকে অ্যাঙ্গোলার বৈধ সরকার রূপে স্বাকৃতি দিয়েছে।

কনসটান্স হাসতে হাসতে বলল, একেই বলে রাজনীতি। হয়ত কয়েক ঘণ্টা আগেও জাইরের প্রেসিডেণ্ট মোবুতু ডাক্তার নেটোর মুণ্ডপাত কামনা করেছে, তার শ্যালকের সৌভাগ্যের সোপান খুলে দিতে সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজি ছিল অথচ ওভার নাইট মোবুতু ডাক্তার নেটোকে স্বীকার করে নিল। মোবুতু ভুলে গেল তার কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ, ভুলে গেল তার শ্যালক প্রীতি। এটাই নাকি রাজনীতি।

এমন রাজনীতিতে আমার আস্থা নেই। এমন ভাবে মত বদল করে যারা তারা মহাশয় ব্যক্তি হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ওটা নীতি কথা। রাজনীতির কথা এটা নয়। রাজনীতিতে আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যা। প্রয়োজনের দাসত্ব করে রাজনীতিবিদ্‌রা। অপ্রয়োজনীয় নীতি কথা বাইবেলের পাতায় ছাপা থাকে, বাস্তবক্ষেত্রে কোন কালেই প্রয়োগ করা হয় না। মিথ্যা প্রচার হল রাজনীতির সাফল্যের পথে বড় অস্ত্র। সেজন্য এই অস্ত্রকে কোন ক্রমেই ভোঁতা করা রাজনীতি ব্যবসায়ীর কর্তব্য নয়। যারা তা করে না তারা রাজনীতির রঙ্গভূমিতে অপাংক্তেয় হয়ে থাকে চিরকাল। মোবুতু বুদ্ধিমান লোক। প্রয়োজনের দাসত্ব করাই তার ধর্ম।

আরও একটা খবর শুনে এসেছি। সেটা আরও গুরুতর।

কনসটান্স মুখ তুলে তাকাতেই মারিয়া আবার বলল, রোডেশিয়ার সঙ্গে মোজাম্বিকের লড়াই আসন্ন। পরিণাম সুখের হবে বলেই আশা করছি।

পশ্চিম সীমান্তের রণ দামামার আওয়াজ তখনও আকাশ বাতাস কম্পিত করছে, এমন সময় রণ দামামার আওয়াজ শোনা গেল পূর্ব সীমান্তে। আফরিকার কালোমানুষ মাতাল হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে। আফরিকার বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন মুছে হাতিয়ার হাতে ছুটছে কালো মানুষের দল। তাদের গতিরোধ করার শেষ চেষ্টা করছে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা রোডেশিয়া আর দক্ষিণ আফরিকায়।

রাজধানী মাপুটোতে মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্ট সামোয়া ম্যাচেলের সামনে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের প্রতিলিপি। গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ছে ম্যাচেল।

রোডেশিয়া সীমান্তে গেরিলাদের সঙ্গে রোডেশিয়ান সীমান্ত রক্ষীদের সংঘর্ষ।

এই সংঘর্ষকে অজুহাত রূপে ব্যবহার করে রোডেশিয়ান বাহিনী মোজাম্বিকের সীমান্তবর্তী গ্রাম আক্রমণ করে শান্তিপ্রিয় অসামরিক গ্রামবাসীদের হত্যা করেছে।

নিকটবর্তী মোজাম্বিক সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করেছে।

মোজাম্বিকের স্বাধীনতা বিপন্ন।

বিগত কয়েক বৎসর যাবত বহু রক্তপাত ঘটিয়ে মোজাম্বিক সবে মাত্র কয়েকমাস আগে স্বাধীনতা লাভ করেছে। আজ পর্যন্ত মোজাম্বিক নিজের ঘরোয়া জরুরী বিষয়গুলোই সামলে উঠতে পারেনি। এমন সময় মোজাম্বিকের ওপর গেরিলা বিতাড়নের অজুহাতে হামলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রেসিডেন্ট ম্যাচেল চিন্তিত।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন বিশপ আবেল মুজোরোয়া।

রোডেশিয়া ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্য অন্তর্ভূক্ত। ইংরাজ স্বাধীনতা দান করবে রোডেশিয়াকে। ইংরেজ তার অতি পরিচিত দুষ্ট নীতি অবলম্বন করে রোডেশিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করে ঘরে ফিরে যাবে। উত্তর রোডেশিয়াকে দিয়ে গেল কালো মানুষদের হাতে, তার নতুন নাম হল জাম্বিয়া। আর শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ বজায় রাখতে দক্ষিণ রোডেশিয়াকে তুলে দেবার আগেই একক শ্বেতাঙ্গরা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। দক্ষিণ রোডেশিয়াই বর্তমান রোডেশিয়া।

যেখানে শতকরা পাঁচভাগ মাত্র শ্বেতাঙ্গ সেখানে গরিষ্ঠদের দাবী অস্বীকার করে লঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের ক্ষমতা নেবার অর্থ অশান্তিকে চিরকালের জন্য জিইয়ে রাখা। রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রায় সবাই ইংরেজবংশোদ্ভূত। তাদের জন্য ইংরেজদের দুর্বলতা থাকা আশ্চর্য নয়।

শতাধিক বৎসর আগে রোডেশিয়াকে আবিষ্কার করেছিল লিভিংস্টোন। সেই সময় থেকেই দলে দলে ইংরেজ এসে বসবাস করতে থাকে রোডেশিয়াতে। এদের শতকরা দশজনও মাতৃভূমি

দেখেনি। এরাই ঘরবাড়ি ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কায়েম হয়ে বসেছে ধীরে ধীরে। এই কায়েমী অধিকার পরিত্যাগ করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিলনা ইংরেজদের। এই অধিকার যাতে অস্ত্র বলে ভোগ করতে পারে সে জন্যই রোডেশিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করা। কিন্তু কালো মানুষরা এই বিভাগকে মেনে নিলেও কোন সময়ই বিভক্ত রোডেশিয়ার দক্ষিণ অংশে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য স্বীকার করতে রাজি হয় নি। নিরস্ত্র কালো মানুষরা প্রতিবাদ জানাল ইংরেজ সরকারকে। ইংরেজ সরকার বলল, আমাদের উদ্দেশ্য হল রোডেশিয়াতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হোক।

নির্দেশ হল কাগজ কলমের বিষয়। বাস্তব যা দেখা গেল তা হল গরিষ্ঠদের কোন অধিকার স্বীকার না করে লঘিষ্ঠরা সকল ক্ষমতা দখল করেছে। হঁা, গণতন্ত্র কায়েম হল, রোডেশিয়ার গণতন্ত্র হল শ্বেততন্ত্র অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ।

এবার কালো মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামল।

তারা গড়ে তুলল নতুন দল, তার নাম হল African National Council of Rhodesia, অল্পকথায় ANC. এদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করল একজন বিশপ। এই বিশপ হল আবেল মুজোরোয়া। সন্ত্রাস সৃষ্টি হল রোডেশিয়ার পথেঘাটে। শ্বেতাঙ্গরাও পেছনে পরে থাকল না। তারাও সন্দেহভাজন আফরিকানদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল, সামান্য অপরাধের জন্য বিচারের প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে লাগল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে হত্যা করতে লাগল।

রোডেশিয়ার মাটি লাল হল কালো মানুষের রক্তে।

তবুও শান্ত হল না কালো মানুষ।

শ্বেতাঙ্গরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প করল, জন্তু-জানোয়ারের মত গুলি করে, খেতে না দিয়ে বর্বরের মত কালো মানুষদের হত্যা করতে লাগল।

কালো মানুষও চুপ করে বসে রইল না। তারা দলে দলে আশ্রয় নিল জাম্বিয়াতে। সেখান থেকে রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকা আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। শ্বেতাঙ্গদের সম্পদ জ্বালিয়ে দিয়ে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে পঙ্গু করতে থাকে।

ছুটে এল ইংরেজদের মুরুব্বীরা।

তারা রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ খুঁজতে অনুরোধ করল। কিন্তু আয়ান তাঁর জেদ ছাড়তে রাজি নয় তবে কিছুটা কনসেশন দিতে রাজি।

আয়ান কালো মানুষদের শাসন কার্যে নিতে অনিচ্ছুক নয় তবে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য থাকবে সর্বক্ষেত্রেই।

কালো মানুষদের সভা সমিতি দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল, রোডেশিয়ার সমস্যা সমাধান করার একটি মাত্র পথ রয়েছে। সেই পথ হল, গরিষ্ঠদের শাসন। বয়স্কদের ভোটে যারা নির্বাচিত হবে এবং তাদের মধ্যে যারা গরিষ্ঠ সংখ্যক তারাই পরিচালনা করবে রোডেশিয়ার শাসন কার্য। এই গরিষ্ঠদের সবাই যদি শ্বেতাঙ্গ হয় তাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু লঘিষ্ঠদের শাসন তারা স্বীকার করে না।

আয়ান স্মিথ এতকাল নিশ্চিন্ত ছিল। কালো মানুষ যতই আন্দোলন করুক তারা কিছুই করতে পারবে না। তার সহায়তায় রয়েছে পর্তুগীজ সরকার এবং দক্ষিণ আফরিকা। এদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় থাকলে কালো মানুষ এবং তাদের নিকটবর্তী স্বাধীন-দেশগুলো কিছুই করতে পারবে না।

মোজামবিক-অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজরা চরম অত্যাচারে পদানত করেছিল কৃষ্ণাঙ্গদের, দক্ষিণ আফরিকা বর্ণ বিদ্বেষ সর্বজন বিদিত, তার সঙ্গে যোগ দিল রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথ।

রাষ্ট্রসংঘে এই অত্যাচার ও অবিচারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা

হল। রাষ্ট্রসংঘ বলল পর্তুগীজ সরকারের উচিত মোজাম্বিক অ্যাঙ্গোলা সহ অন্যান্য উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করা।

পর্তুগীজরা বলল, ওগুলো আমাদের উপনিবেশ নয়। ওগুলো পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পর্তুগালের নাগরিকরা যে অধিকার ভোগ করে সেই অধিকার এই সব এলাকার বাসিন্দারাও ভোগ করে।

রাষ্ট্রসংঘ এই সব যুক্তি স্বীকার করল না কিন্তু পর্তুগীজদের প্রধান সহায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ পর্তুগীজদের যুক্তি স্বীকার না করলেও পর্তুগালের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল না, ফলে আফরিকার পর্তুগীজ শাসিত কালো মানুষদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল না। রাজনৈতিক এই ধাপ্পাবাজীতে ভুলল না কালো মানুষের দল। তারা স্বাধীনতালাভের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে নেমে পড়ল।

রাষ্ট্র সংঘ সদস্যরা প্রস্তাব দিল, দক্ষিণ আফরিকা ও রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অর্থনৈতিক বয়কটের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হল।

কিন্তু দক্ষিণ আফরিকার সমুদ্রপথ খোলা। খোদ মার্কিনদেশের ভাগ্যবিধাতারা নীতিগত ভাবে অর্থনৈতিক বয়কট স্বীকার করলেও কার্যক্ষেত্রে তারাই সাহায্য পাঠায় দক্ষিণ আফরিকায়। দক্ষিণ আফরিকা আর পর্তুগীজ সরকারের মারফত রোডেশিয়াতে পণ্য সম্ভার আসতে থাকে দেশ বিদেশ থেকে। এ বাদেও চোরাপথে বাণিজ্য চলতে থাকে।

রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথ এবং দক্ষিণ আফরিকার ভোরষ্টার ভাবতেও পারেনি কোনদিন তারা সত্যি সত্যি অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিপন্ন হবে।

আয়ান স্মিথ অবশ্য বিশপ আবেলের সঙ্গে মীমাংসার জন্য আলোচনায় বসেছিল।

কালো মানুষদেব নেতা বিশপ আবেলের সঙ্গে আয়ান স্মিথ দেখা

করল। স্থান পূর্বেই স্থির ছিল। ভিকটোরিয়া হ্রদের কাছে কোন এক নদীর সাঁকোর ওপর একটি রেলের কামরায় দুজনের দেখা হল। এই সাঁকো জাম্বিয়া রোডেশিয়ার সীমান্তে। এমন ভাবে সাঁকোটি অবস্থিত যাতে কোন পক্ষই সাঁকোর ওপর কোন দাবী তুলতে না পারে এবং প্রয়োজন মত যে যার নিজস্ব নিরাপদ এলাকায় অতি অল্পক্ষণে যেতে পারে। দেখা গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস না করার ফলে এই সাঁকোকে 'বাফার' এলাকা মনে করা হয়েছিল।

এত তোড়জোড় করে আলোচনা হলেও আয়ান স্মিথ তার দম্ভ পরিত্যাগ করতে পারল না। বিশপ প্রতিশ্রুতি দিল, গরিষ্ঠ শাসনে শ্বেতাঙ্গদের ভীত হবার কোন কারণ নেই, সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থবজায় রাখার সব ব্যবস্থা থাকবে রোডেশিয়ার সংবিধানে। এতেও খুশী হল না আয়ান স্মিথ। ভেঙ্গে গেল আলোচনা।

দক্ষিণ আফরিকা কোন ক্রমেই তার বর্ণ-বিদ্বেষ নীতি পরিহার করতে রাজি নয়। উপরন্তু তার প্রোকেটটরেট নামবিয়ার ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে নামিবিয়াকে দক্ষিণ আফরিকার সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী।

হেন কালে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত লিসবনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল। কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন লিসবন সরকার ঘোষণা করল, আমরা সকল উপনিবেশকে স্বাধীনতা দান করব। এবং স্বাধীনতা দানের তারিখও ঘোষণা করল। যাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে তাদের তালিকায় মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলার নামও আছে।

রোডেশিয়ার রাজধানী স্যালিসবারিতে দুশ্চিন্তার ছায়া। শ্বেতাঙ্গদের হৃদকম্প উপস্থিত। আয়ান স্মিথ আত্মরক্ষার তাগিদে নানা দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগ দিল, আধুনিক অস্ত্র দিয়ে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হল, আধুনিক অস্ত্র দিয়ে সামরিক বাহিনীকে সকল অবস্থার মোকাবিলা করার উপযোগী করতে লাগিল।

আয়ান স্মিথ আফরিকার মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই হতাশ হয়ে পড়ছিল। উত্তর পশ্চিম জুড়ে জাম্বিয়া। উত্তর-পূর্বে মোজামবিক এবং তাদের চলাচলের একমাত্র পথ হল দক্ষিণ আফরিকার স্থলপথ। এতকাল মোজাম্বিকের পথে পণ্য আনা নেওয়া সম্ভব হলেও বর্তমানে সে উপায় নেই।

স্বাভাবিকভাবেই রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফরিকা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

তারা নানা ফন্দী খুঁজছিল যাতে তাদের স্বার্থহানি না ঘটে।

মোজাম্বিক স্বাধীনতা লাভ করল।

রোডেশিয়া মোজাম্বিককে অসন্তুষ্ট করতে চায় নি। কড়া নজর রেখেছিল মোজাম্বিকের ওপর। কিন্তু মোজাম্বিক আঘাতে আঘাতে বড়ই শক্ত হয়েছিল। মোজাম্বিকের একমাত্র রাজনৈতিক দল FRELIMO-এর প্রেসিডেন্টকে পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলার সময় তানজানিয়ার রাজধানী দারেস সালামে শ্বেতাঙ্গদের অর্থপুষ্ট গুপ্তঘাতক হত্যা করেছিল। সেই FRELIMO বর্তমানে মোজাম্বিকের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছে। তারা কোন ক্রমেই রোডেশিয়ার অথবা অন্য কোন এলাকার শ্বেতাঙ্গদের আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিল না। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করতে শ্বেতাঙ্গরা যে সব সময় সচেষ্ট সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না।

অ্যাঙ্গোলার অবস্থা অন্য প্রকার। সেখানে স্বাধীনতা লাভের আগেই তিনটি দলের আবির্ভাব। এই তিনটি দলই নিজ নিজ সম্পদ আঁকড়ে ধরে আছে। এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল দক্ষিণ আফরিকা ও রোডেশিয়া। অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধকে স্থায়ী করতে পারলে শ্বেতাঙ্গদের সাম্রাজ্য নিরাপদ। এই দুষ্ট চক্র কিছুটা সাফল্য লাভ হয়ত করতে পারত, অন্তত গৃহযুদ্ধকে বহুকাল স্থায়ী করতে পারত, তা সম্ভব হয়নি কেবলমাত্র মার্কিন সরকারের সাহায্য দানের অস্বীকৃতিতে। এই কারণেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুষ্ট চক্রকে

ভেঙ্গে ফেলে প্রগতিশীল MPLA-এ গোটা অ্যাঙ্গোলার শাসন ক্ষমতা লাভ করাতে রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফরিকার মনে শঙ্কা জেগেছে। এরা ত্বরিতে কোন পথ অবলম্বন করবে তা স্থির করতে পারছে না। উপরন্তু বিশ্ব জনমত এই দুই দেশের স্বপক্ষে না থাকায় অচিরে য়ে এই দুই দেশ বিপন্ন হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। উভয় দেশই তাদের মুরুব্বীদের শরণাপন্ন হল, কোন সুফল দেখা দেবার আগেই বিপদ দেখা দিল রোডেশিয়ার।

মোজাম্বিক সীমান্তে রোডেশিয়ান সৈন্যের উপস্থিতি-ই বিপদকে ত্বরান্বিত করল।

রোডেশিয়ার কর্ম পদ্ধতি লক্ষ্য রেখে মোজাম্বিক বুঝেছিল তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে পারলে আরও কিছুকাল রোডেশিয়াতে আয়ান স্মিথ তার বে-আইনী সরকারকে কায়েম রাখতে পারবে। অতি তৎপরতার সঙ্গে এখুনি বাধা দেবার প্রয়োজন।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাচেল ঘোষণা করল, মোজাম্বিক-রোডেশিয়া সীমান্ত বন্ধ করে দাও। এই সীমান্ত পথ দিয়ে মানুষ ও পণ্যের যাতায়াত অবিলম্বে বন্ধ কর। সীমান্ত রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাচেল এইখানেই থামল না। ঘোষণা করা হল, আজ তেসরা মার্চ থেকে মোজাম্বিকের সঙ্গে রোডেশিয়ার যুদ্ধাবস্থা চলবে।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রোডেশিয়ান সরকার সকল শ্বেতাঙ্গ রোডেশিয়ানদের মোজাম্বিক পরিত্যাগ করে রোডেশিয়াতে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাচেল আদেশ দিল, মোজাম্বিকে শ্বেতাঙ্গ রোডেশিয়ানদের গ্রেপ্তার কর এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর।

রোডেশিয়ান সরকারের, অথবা রোডেশিয়ান শ্বেতাঙ্গদের

বাণিজ্য কুঠির অথবা কোন শ্বেতাঙ্গ রোডেশিয়ানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঙ্গে সঙ্গে মোজাম্বিক সরকার আটক করল। (all property and assets owned in Mozambique by the illegal regime, by firms with offices in Rhodesian territory and by Rhodesian citizens recognising the illegal regime had been consficated.)

বিশপ আবেল এরই প্রতীক্ষা করছিল।

অর্থনৈতিক বয়কট রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে সুপথে পরিচালিত করতে পারবে এটাই তার বিশ্বাস। এতকাল যে ছোট-খাট যুদ্ধ বা হাঙ্গামা চলছিল এবার তার শেষ হল। বৃহত্তর হাঙ্গামার অথবা যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত হল।

রোডেশিয়ার ইতিহাস বড়ই করুণ এবং বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ।

আয়ান স্মিথ ইংরেজ বংশোদ্ভূত। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের নেতা। ইংরেজ যখন রোডেশিয়া পরিত্যাগ করে যাবার সঙ্কল্প জানাল তখনই শ্বেতাঙ্গ সমাজ ভীত হয়ে পড়েছিল। এতকাল শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় কৃষ্ণাঙ্গদের পদানত করে রেখে স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়েছে। হঠাৎ তারা যদি ক্ষমতা লাভ করে তা হলে শ্বেতাঙ্গদের মান মর্যাদা সম্পদ ও জীবন কোনটাই আর নিরাপদ থাকতে পারে না।

ইংরেজ সরকার আইন করে রোডেশিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুযোগ আর পেল না। ইংরেজ সৈন্যের একটি বিভাগের সহায়তায় এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজের সমর্থনে শ্বেতাঙ্গদের নেতা আয়ান স্মিথ এক তরফা ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক মিটিয়ে ফেলল।

আয়ান স্মিথের এই ফ্যাসিষ্টসুলভ কাজের সমর্থন কেউ করল না। পঁয়ষট্টি সালের নভেম্বর মাস থেকে রোডেশিয়াতে কায়েম হল বর্বর শাসন ব্যবস্থা। কৃষ্ণাঙ্গরা প্রতিবাদ জানাল তার প্রত্যুত্তর পেল রক্তপাতের মাঝ দিয়ে।

বিশ্বের সকল রাষ্ট্র আয়ান স্মিথের সরকারকে আইন সম্মত সরকার বর্লে স্বীকার করল না।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের একটি অংশ এই ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও ইংরেজের সামর্থ্যও ছিল না সৈন্য পাঠিয়ে রোডেশিয়াতে ন্যায়সম্মত সরকার প্রতিষ্ঠা করার।

কাগজে কলমে ইংরেজ সরকার আয়ান স্মিথের সরকারকে স্বীকার না করলে তাদের বংশোদ্ভূত রোডেশিয়ান শ্বেতাঙ্গদের জন্য তাদের দুর্বলতা ও দরদ থেকে গেল। তারা পরোক্ষে আয়ান স্মিথের সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলছিল এতকাল।

রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গরা কিন্তু চুপ করে রইল না। তাদের কথা বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘ উত্থাপন করল অন্যান্য সদস্যরা। এ বিষয়ে আলোচনা হল নিরাপত্তা পরিষদে।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা প্রস্তাব দিল, রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য পাঠিয়ে রোডেশিয়া থেকে আয়ান স্মিথের সরকারকে সরিয়ে দিতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিল কিন্তু রাষ্ট্র সংঘের যে পাঁচজন সদস্যের ভেটো দেবার অধিকার রয়েছে তাদের অন্যতম হল বৃটেন।

বৃটেন কাগজে কলমে আয়ান স্মিথকে সমর্থন না করলেও এবার আয়ান স্মিথকে রক্ষা করতে একমাত্র বৃটেনই এগিয়ে এল। বৃটেন ভেটো দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব নাকচ করে দিল।

কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যারা শক্তির সাহায্যে আয়ান স্মিথের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় তাদের নেতা বিশপ আবেল। তার সঙ্গী হল রেভারেণ্ড এন্দাবানিনগী। এরা দু জনই গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করল। এদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হল মোজাম্বিকে।

আয়ান স্মিথ তার নিজস্ব সমস্যা সমাধানের উপযোগী ব্যক্তি

খুঁজে বেড়াতে থাকে। সহজেই পেয়ে গেল নরমপন্থী এনকোমাকে। এই নেতা চায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। অন্তত গরিষ্ঠ শাসন কায়েমের পক্ষপাতী হলেও লঘিষ্ঠদের রক্ষা কবজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী। রোডেশিয়ার অবস্থা দেখে চলছিল ইংরেজ সরকার। তারা নীরব দর্শক নয়। তারাও চায় এনকোমার মত লোক। এর সাহায্যে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন ফরমুলা বের করাই হল বড় কাজ। তা না হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর উত্তর পুরুষদের চিরতরে রোডেশিয়া ত্যাগ করে যেতে হবে। বৃটেনের বণিক স্বার্থ বিপন্ন হবেই।

এই সব রাজনৈতিক ঘনঘটা লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য পাঠিয়েছে পাকা খেলোয়াড় লর্ড গ্রীন হিলকে। তার উদ্দেশ্য শেষ রক্ষা করার পথ উদ্ভাবন।

হয়ত একটা মীমাংসা সম্ভব হত, হয়ত গরিষ্ঠ শাসনে লঘিষ্ঠদের সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষিত হত। কিন্তু আয়ান স্মিথের হঠকারিতায় ঘটনার মোড় ঘুরে গেছে। আয়ান স্মিথের সৈন্য যদি মোজাম্বিকের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করত, নিকটবর্তী গ্রামে রোডেশিয়া বোমা নিক্ষেপ না করত তা হলে চিত্র অন্যরূপ হতে পারত।

মোজাম্বিক থেকে গেরিলারা রোডেশিয়া আক্রমণ করছে।

লেবানন ও সিরিয়া থেকে প্যালেসটাইনী গেরিলারা ইস্রায়েল আক্রমণ করে। এই গেরিলাদের ঘাঁটিতে ইস্রায়েল বোমা বর্ষণ করে থাকে। আয়ান স্মিথ বোধহয় সেই পন্থা গ্রহণ করতে চায়।

গোটা ইস্রায়েলে ইহুদীর সংখ্যা শতকরা নব্বইজন। তার পক্ষে যা সম্ভব তা সম্ভব নয় রোডেশিয়ার পক্ষে। রোডেশিয়ার শতকরা পঁচানব্বই জনই কৃষ্ণাঙ্গ। জনসাধারণের কোন সমর্থনই আয়ান সরকার পায়নি এবং পাওয়া সম্ভব নয়।

ইস্রায়েলকে আর্থিক সাহায্য ও অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে আমেরিকা। রোডেশিয়ার সেই সাহায্য থেকে বঞ্চিত। রোডেশিয়া আশা করছে

ইংরেজের সাহায্য কিন্তু ইংরেজ সরকার কোনরূপ সাহায্য দেবে না এটা পূর্বেই ঘোষণা করেছে। সাহায্যকারীরূপে এতকাল পেয়েছে পর্তুগালকে। সেই পর্তুগালই এখন ঘরোয়া বিবাদে বিপন্ন উপরন্তু রোডেশিয়াতে সাহায্য পৌঁছে দেবার কোন পথ নেই তাদের।

ভরসা শুধু দক্ষিণ আফরিকা। দক্ষিণ আফরিকার মারফত বিমানে মার্কিন সাহায্য লাভ করার চেষ্টা করছে আয়ান স্মিথ কিন্তু সেখানেও বিপদ।

অ্যাঙ্গোলায় ডাক্তার নেটোর সাফল্য গোটা কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মনে নতুন ভাবে উৎসাহ উদ্দীপণা সৃষ্টি করেছে, এখন তারা গোটা আফরিকাকে পরশাসন মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর।

এদিকে তাদের নজর রোডেশিয়ার উপর। সেখানে যে বে-আইনী সরকার চলছে তাকে ধ্বংস করতে তারা এগিয়েছে। মুক্ত অ্যাঙ্গোলার পাশে রয়েছে নামিবিয়া, এবার তাকে মুক্ত করতে কৃষ্ণাঙ্গরা হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নামিবিয়া লীগ অব নেশনসের তত্ত্বাবধানে আসে। দক্ষিণ আফরিকাকে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নামিবিয়া দক্ষিণ আফরিকার অংশ নয়। একটি ম্যানডেটরী দেশ। এই ম্যানডেটরী দেশকে দক্ষিণ আফরিকা গ্রাস করেছে ছেষট্টি সালে। এই বছর ম্যানডেট শেষ হয়েছিল। স্থির ছিল রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে একটি স্বাধীন সার্বভোম রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। কিন্তু দক্ষিণ আফরিকা নামিবিয়ার অধিকার ছাড়তে রাজি হয় নি। এর ফলে ন্যায়সম্মতভাবে নামিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করেনি। রাষ্ট্রসংঘের সকল নির্দেশ অমান্য করেছে দক্ষিণ আফরিকা। সাতষট্টি সালে রাষ্ট্রসংঘের এগারজন সদস্য নিয়ে একটি প্রশাসন পরিষদ গঠিত হয়, তাকেও দক্ষিণ আফরিকা কাজ করতে দেয়নি।

লীগ অব নেশনস যখন নামিবিয়া তত্ত্বধান করার সাময়িক দায়িত্ব

দেয় তখন সর্ত ছিল নামিবিয়া থাকবে যুদ্ধ মুক্ত অঞ্চল। এই দেশের মাঝ দিয়ে কেউ কোনরূপ সৈন্যবাহিনী চলাচল করাতে পারবে না। দক্ষিণ আফরিকা এই সর্ত লঙ্ঘন করে গত ডিসেম্বর মাসেই অ্যাঙ্গোলা দখল করতে দক্ষিণ আফারিকা নামিবিয়াতে সৈন্য পাঠানোতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে পড়েছে।

এখনও নামিবিয়ার সীমান্তে দক্ষিণ আফরিকা সৈন্যের ঘাঁটি রয়েছে সীমান্তের ওপারে অ্যাঙ্গোলার ভূমিতে।

দক্ষিণ আফরিকার জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে অ্যাঙ্গোলায়, নামিবিয়া সীমান্তে। এই জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রটি হাতে রাখার দাবী জানিয়েছে দক্ষিণ আফরিকা। এই সর্ত না মানলে তারা সৈন্য সরিয়ে নেবেনা স্থির করেছে।

ডাক্তার নেটোর সরকার বলেছে, তোমাদের কোন কথা শুনতে আমরা রাজি নই। অ্যাঙ্গোলার মাটি থেকে বিনা সর্তে তোমাদের ফিরে যেতে হবে, নইলে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের হটিয়ে দেব।

দক্ষিণ আফরিকা এখনও আশা করছে আমেরিকা ও পশ্চিমী শক্তিরা তাকে সাহায্য করবে।

এদিকে অ্যাঙ্গোলাকে সমর্থন জানিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া ও কিউবা। সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে আফরিকার তাবৎ জাতীয়তাবাদী কৃষ্ণাঙ্গদের রাষ্ট্র।

এদিকে নামিবিয়ার অভ্যন্তরে গেরিলারা সক্রিয়। তাদের মদৎ দিচ্ছে অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, কিউবা, সোভিয়েত রাশিয়া। এই সাহায্য এরা করতে প্রতিশ্রুত।

এমত অবস্থায় রোডেশিয়াকে দক্ষিণ আফরিকা সাহায্য করতে পারবে না। তার ঘর সামলাতেই হিমসিম খাবে। ঘটনার গতি দেখে অনুমান করা যায় আফরিকার মাটি থেকে শ্বেতাঙ্গ শাসন চিরতরে লুপ্ত হবে অচিরেই।

অ্যাঙ্গোলা সম্পূর্ণ মুক্ত।

রোবের্টো ও সাভিমবি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েতে স্থান নিয়েছে।

মোজাম্বিক ও রোডেশিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলেছে।

জাম্বিয়া ও রোডেশিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান।

সোভিয়েত রাশিয়া ও কিউবার কাছে উগাণ্ডা আবেদন জানিয়েছে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে মোজাম্বিককে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে।

অ্যাঙ্গোলায় ডাক্তার নেটোর সাফল্য অবশ্যই সোভিয়েত নীতির জয় ঘোষণা করেছে এবং রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করা সেই নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

তানজানিয়ার প্রেসিডেণ্ট নেয়ারের (Neyrere) আর মোজাম্বিকের প্রেসিডেণ্ট ম্যাচেল আলোচনা শেষ করেছে। তানজানিয়া চিরকাল মোজাম্বিকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করেছে। এবারও তারা মোজাম্বিককে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করবে।

রাষ্ট্রসংঘ রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথ সরকারকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে যার ফলে পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্র মোজাম্বিককে সমর্থন জানাবে।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড রোডেশিয়াকে সমর্থন জানান নি। প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড বলেছেন, রোডেশিয়া এবং নামিবিয়ার সরকার বে-আইনী সরকার। তাদের পরিবর্তন চাই। অবশ্য অহিংসার পথে এই পরিবর্তন তার কাম্য (Governments in Rhodesia and South-West Africa (Namibia) to be illegal and he hopes that any changes in the situations there will be brought about without restoring to violence.) যারা যুক্তি মানে না, ন্যায় ধর্ম মানে না, যারা মনুষ্যত্বকে হত্যা করে নিজস্ব স্বার্থে তাদের পরিবর্তন অহিংসার পথে সম্ভব কি না সেটাও ভাববার বিষয়। প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড হয়ত হতাশ হবেন কেননা এরূপ ক্ষেত্রে অস্ত্রের মুখেই সমস্যার সমাধান হবে নিশ্চিত।

জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কুণ্ডা বলেছেন, মোজাম্বিকের ওপর আক্রমণকে জাম্বিয়ার ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে।

আফরিকার আকাশে কালো মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। যে কোন সময় গোটা আফরিকাতে আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

কিন্তু এটা অপরিহার্য নয়।

দক্ষিণ আফরিকার ও রোডেশিয়ার শুভ বুদ্ধির উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

অ্যাঙ্গোলায় জাইরে ও দক্ষিণ আফরিকার যে ভূমিকা তা অতীব নিন্দনীয়। এই নিন্দনীয় পথে অ্যাঙ্গোলার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার স্থাপনের অপচেষ্টা ব্যর্থ হতেই নতুন সমস্যাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লুয়ান্ডার বন্দরে জাহাজের ভোঁ শব্দে শোনা যায় দিবারাত্রি। জাহাজের যাতায়াত বিঘ্ন হীন।

ড্রাই ডকে মেরামতির জাহাজ 'জলযান' সেদিন কর্ম মুখর। মেরামতি শেষ। এবার জাহাজ জলে ভাসবে। জাহাজের ডেকে জাহাজীর ছোটাছুটি করছে। বহুদিনের অব্যবহৃত জিনিসপত্র গোছগাছ করা হচ্ছে। উপরের ব্রীজে দূরবীণ হাতে করে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপটেন।

নীচের ব্রীজে ডাক্তার জোনাস অলস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে বন্দরের দিকে।

জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দর এলাকা ছেড়ে ক্রমেই সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকে।

কি ভাবছ ডাক্তার জোনাস? —প্রশ্ন করল মিসাউদি।

আমি বিশ্লেষণ করছি মনে মনে।

কি বিশ্লেষণ করছ বন্ধু?

আফরিকার ভাগ্য কোন দিকে মোড় নেবে। অ্যাঙ্গোলা, মোজামবিক আর রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফরিকা। এরা কোন পথে চলছে।

কি পেলে? কি তোমার বিশ্লেষণ?

পেয়েছি তবে খুবই ঝাপসা। খুবই অস্পষ্ট। এখনও বোধহয় সময় হয়নি বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করার।

সেটাই শুনতে চাই।

ডাক্তার জোনাস কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মেঘ। এই মেঘ গোটা আফরিকাকে কেবলমাত্র গ্রাস করবে না। সাম্রাজ্যবাদী সকল শক্তি এই মেঘের তলায় ঢাকা পড়বে। ঝড় উঠেছে, তুফান টাইফুন সামনে। ভেঙ্গেচুরে নতুন জীবনের সন্ধান পাবে আফরিকার কালো মানুষ।

ডাক্তার জোনাস বলতে থাকে :

ছোটখাট লড়াই আর নেই। বেশ ভালভাবেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলেছে। অ্যাঙ্গোলা থামবে না, মোজাম্বিকও থামবে না। দুটো শ্বেতাঙ্গ শাসিত রাষ্ট্রের পতন দিব্য দৃষ্টিতে দেখছি। সর্বাগ্রে পতন ঘটবে রোডেশিয়ার। তার লক্ষণ দেখা গেছে। রোডেশিয়াও অ্যাঙ্গোলাতে সৈন্য পাঠিয়েছিল ডাক্তার নেটোকে উৎখাত করতে। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে তারা পালিয়েছে। রোডেশিয়ান সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে গেছে ইতিমধ্যে। এবার মোজাম্বিক আঘাত করতে নেমেছে, তাকে সহায়তা করছে সোভিয়েত রাশিয়া, কিউবা, জাম্বিয়া, উগাণ্ডা ও অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ।

ম্যাচেল সীমান্ত বন্ধ করেছে। যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেছে। সৈন্য সমাবেশ করেছে।

মোজাম্বিক বিশপ মুজোরেয়ার সমর্থনে হাতিয়ার হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।

রোডেশিয়াতে যেভাবে বছরের পর বছর ধরে গেরিলা আক্রমণ চলেছে তার ধাক্কা সামলাতে রোডেশিয়ার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। তবুও মোজাম্বিক অর্থনীতির দিক থেকে রোডেশিয়ার ওপর কিছুটা নির্ভরশীল ছিল। এই হাঙ্গামায় মোজাম্বিকের যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করতে ভারত সহ সকল কমনওয়েলথ দেশ প্রতিশ্রুত।

মোজাম্বিক যে পথ নিয়েছে তা রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত। সেজন্য বৃটিশ সরকারও মোজাম্বিককে সমর্থন জানিয়েছে। দক্ষিণ আফরিকা রোডেশিয়াকে সাহায্য করতে মোটেই সাহস পাবে না। তা করতে গেলে দক্ষিণ আফরিকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে, দক্ষিণ আফরিকার শ্বেতাঙ্গদের বিদায় নিতে হবে সেখান থেকে। দক্ষিণ আফরিকার প্রেসিডেন্ট ভোরস্টার কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে মুখোমুখী কলহে নামতে চায় নি। কিন্তু ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সেতুতে বসে আয়ান স্মিথ যেভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের দাবী উপেক্ষা করছে তাতে দক্ষিণ আফরিকা রোডেশিয়ার হাঙ্গামায় জড়াতে চাইবে না।
